বাংলাপিডিএফ

৬৫-৬৬ দুই খণ্ড একত্রে

দস্যু বনহুর ও হামবার্ট

রোমেনা আফাজ

জিহাংহায় দস্যু বনহুর

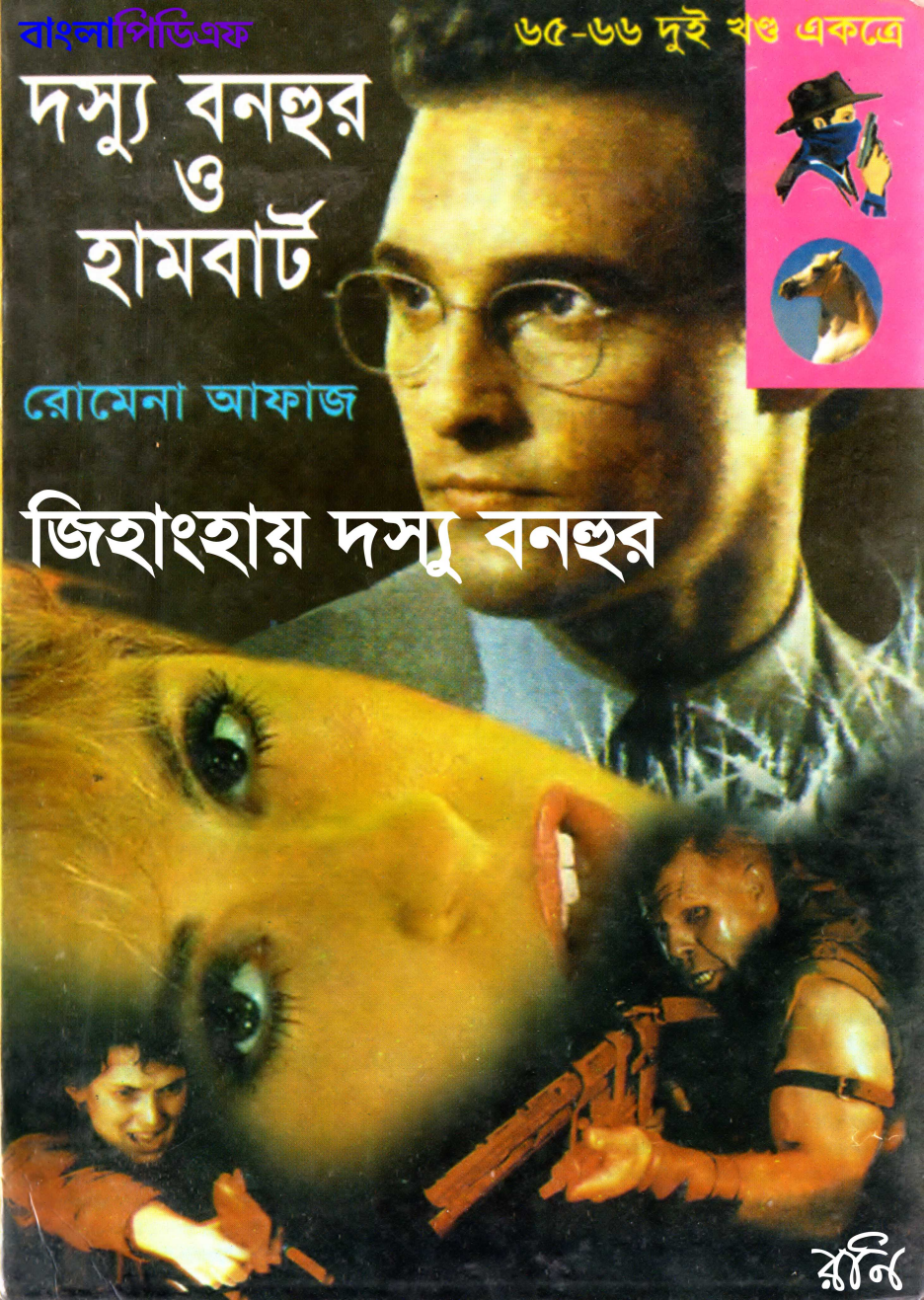

রুনি

দস্যু বনহুর সিরিজ

দুই খণ্ড একত্রে

হামবার্ট ও দস্যু বনহুর-৬৫
জিহাংহায় দস্যু বনহুর-৬৬

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

বনহুরের দু'হাতে দুটি রিভলভার। সমস্ত শরীরে জমকালো পোশাক। মাথায় পাগড়ি, পাগড়ির আঁচল দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢাকা।

চোখ দু'টো মশালের আলোতে যেন জ্বলছে। পায়ে হাটু অবধি ভারী বুট।

হামবার্ট ক্রুদ্ধ কণ্ঠে দাঁতে দাঁত পিষে বললো—এখানে কি করে প্রবেশ করলে?

কয়েক পা সরে আসে বনহুর তারপর বলে—যাদু মন্ত্রের দ্বারা এখানে প্রবেশ করেছি!

জানো তুমি কোথায় এসেছো?

জানি—শিয়ালের গর্তে.....

হিংস্র জানোয়ারের মত গর্জে উঠে হামবার্ট—কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছো জাননা দস্যু বনহুর?

তুমিও জানতেনা কার সঙ্গে কথা বলছো, যদি ওরা আমার পরিচয় না দিতো। শোন হামবার্ট, তোমার জঙ্গল বাড়ির ঘাটির কাজ শেষ হয়ে গেছে তাই আমি এসেছি তোমায় ছুটি দিতে।

ছুটি দিতে! আমাকে?

হাঁ—কেনো বিশ্বাস হচ্ছেনা? হামবার্ট তোমার কু'কীর্তি কান্দাই বাসীর কাছে অজ্ঞাত থাকলেও আমার কাছে গোপন নেই। তুমি সুদূর জিহাংহা থেকে কান্দাই এসেছো, রক্ত আর চক্ষু ব্যবসা চালাতে কিন্তু..... আর নয়!

হামবার্টের চোখ দু'টো বিস্ময় বিস্ফারিত হয়ে উঠে। রক্ত আর চক্ষু ব্যবসা সম্বন্ধে দস্যু বনহুর জানলো কি করে। আর তারা যে সুদূর জিহাংহা থেকে কান্দাই এসেছে শুধু এই ব্যাপারে তাও যে জানে এমন কি তার নামটাও অজানা নেই ওর কাছে।

হামবার্ট ধীরে ধীরে পিছু হটে একটা সুইচে হাত দিতে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর সেখানে এসে দাঁড়ায়—খবরদার এতে হাত দিওনা....

ঐ মুহূর্তে হামবার্টের সঙ্গীদ্বয় নীলাকে ধরে ওদিকে টেনে নিয়ে যায়।

সেই দণ্ডে বনহুরের দক্ষিণ হস্তের রিভলভার গর্জে উঠে। এক সঙ্গে দুটো গুলির শব্দ হয়।

হামবার্ট তাকিয়ে দেখে নীলার দু'পাশে দু'জন ঢলে পড়েছে।

নীলা ছুটে এসে পিতার বুকে মাথা রাখে—আব্বু.....

আমির আলী সাহেবের হাত দু'খানা বাঁধা থাকায় তিনি কন্যাকে কাছে টেনে নিতে পারেন না। তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছেন শুধু। এমন ভাবে হঠাৎ দস্যু বনহুর এসে নীলাকে শয়তান হামবার্টের কবল থেকে উদ্ধার করবে ভাবতে পারেন নি।

নীলাও কেমন যেন হতভম্ভ হয়ে পড়েছে, সে কিছুই বুঝতে পারছেনা। সব যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে তার কাছে। নীলা পিতার পাশে দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছে দস্যু বনহুরের দিকে। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠছে ওর চোখ দুটো।

হামবার্টের সঙ্গীদ্বয় গুহার মেঝেয় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে গুহার পাথুরে মেঝেটা। হাত পা নাড়া দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেলো দেহ দু'টো।

হামবার্ট সঙ্গীদ্বয় এর মৃত্যুতে একটুও ঘাবড়ালোনা।

সে শুধু একবার লাশ দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে আবার তাকালো দস্যু বনহুরের মুখে।

বনহুর গুহার মুখে দাঁড়িয়ে না থাকলেও তার বাম হাতের রিভলভারখানা গুহার মুখ লক্ষ্য করে ধরে ছিলো যাতে হামবার্ট এগুতে না পারে।

হামবার্ট এবার এগুতে থাকে বনহুরের দিকে।

বনহুরও এগোয়।

আচমকা হামবার্ট কোমরের বেলট থেকে একখানা সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা খুলে নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো বনহুরের উপর।

বনহুর চট করে সরে দাঁড়ালো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে হামবার্ট গুহার দেয়ালে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

বনহুর ফিরে তাকিয়ে দেখলো হামবার্ট নেই। আশ্চর্যভাবে সে উধাও হয়েছে। গুহার দেয়ালে সে যেন যাদু মন্ত্রের মত মিশে গেছে।

এক দণ্ড বিলম্ব না করে বনহুর আমির আলী এবং নীলাকে লক্ষ্য করে বললো—আপনারা শীঘ্র আমাকে অনুসরণ করুন.... এই মুহূর্তে হামবার্ট তার জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস করে ফেলবে।

বনহুর গুহায় মুখ অভিমুখে অগ্রসর হলো।

আমির আলী সাহেব এবং নীলা জমকালো ছায়ামূর্তি দস্যু বনহুরকে লক্ষ্য করে যতদূর সম্ভব দ্রুত গুহা থেকে সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পর্বতমালা দুলে উঠলো।

বনহুর বললো—আপনারা ছুটতে শুরু করুন আর এক দণ্ড বিলম্ব হলে কেউ জীবিত থাকা সম্ভব হবে না....

নিজেও বনহুর ছুটতে লাগলো।

একটি সুড়ঙ্গ মুখ থেকে বেরিয়ে অপর একটি সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করলো বনহুর আমির আলী সাহেব এবং নীলা।

সেই মূহুর্তে ভীষণ একটি শব্দ হলো।

বনহুর বললো—মাটিতে উঁবু হয়ে শুয়ে পড়ুন আপনারা..... নিজেও বনহুর মাটিতে উঁবু হয়ে শুয়ে পড়লো।

ততক্ষণে সমস্ত পর্বতটা যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধ্বসে পড়লো।

বড় বড় পাথরের চাপ তাদের চারিদিকে পড়তে লাগলো। সেকি ভীষণ ভূমিকম্পন যেন সমস্ত পৃথিবীটা আজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে চললো এই ধ্বংস লীলা। জংগল বাড়ি ঘাটি শুধু পাথর স্তূপে পরিণত হলো। নীলা আর আমির আলী সাহেব তো সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলার উপক্রম। তারা জীবিত আছে না মরে গেছে ভেবে পেলোনা।

যখন ভূমিকম্পন বন্ধ হয়ে এলো তখন চারিদিকে পাথর ধ্বসে পড়াও থেমে গেছে।

উঠে দাঁড়ালো বনহুর।

প্রথমে সে আমির আলী সাহেবকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললো—আর ভয় নেই খান বাহাদুর সাহেব এবার আপনারা মুক্ত.....

নীলা তখনও পড়েছিলো মাটিতে উবু হয়ে। তার সংজ্ঞা আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

বনহুর নীলাকেও তুলে ধরলো—উঠুন বিপদ কেটে গেছে....

নীলা ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো। অসহায় করুণ সে দৃষ্টি যদিও তার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না তবু বেশ বোঝা যাচ্ছিলো।

হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা থাকায় অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিলো তার।

আমির আলী সাহেবের অবস্থাও তাই। তিনি বৃদ্ধ অবস্থা, তার হাত দু'খানা ফুলে উঠেছে রীতিমত।

বনহুর বললো—আপনারা নিশ্চিন্ত হতে পারেন কারণ আপনারা হামরার্টের আয়ত্বের বাইরে এসে গেছেন।

আমির আলী সাহেব আর নীলা অন্ধকারে বনহুরের দিকে তাকালো, এই বিপদ মুহূর্তে দস্যু বনহুরকে তাদের পরম বন্ধু জন বলে মনে হলো। যে দস্যু বনহুরের নাম স্মরণ করলে তাদের হৃদকম্প শুরু হয় আজ সে যেন কত আপন জন।

আমির আলী সাহেব প্রায় কেঁদে ফেললেন, বললেন তিনি—আপনাকে আমি কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো.....

একটু হাসলো, বনহুর তারপর বললো—ধন্যবাদের কোন প্রয়োজন নেই খাঁন বাহাদুর সাহেব তা ছাড়া আপনি নয় তুমি বলেই আমাকে সম্বোধন

করবেন কারণ দস্যু বনহুরকে কেউ কোনদিন আপনি বলে সম্মান দেখায় না। হাঁ এবার আপনারা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করুন।

আমির আলী সাহেব কন্যাকে লক্ষ্য করে বললেন—এসো মা।

নীলার কণ্ঠ যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। সে পিতার কথায় কোন জবাব দিতে পারলোনা বা অগ্রসরও হলোনা।

বনহুর নীলার মনোভাব বুঝতে পেরে হেসে বললো—ভয় নেই আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।

এসো মা নীলা, এসো। যে তোমাকে নরপশু শয়তানটার হাত থেকে বাঁচিয়ে নিলো সে আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনা।

বনহুর এগিয়ে চললো।

আমির আলী সাহেব এবং নীলা তাকে অনুসরণ করে।

বারবার হোঁচট খাচ্ছিলো নীলা।

আমির আলী সাহেবও পড়ে যাচ্ছিলেন মাঝে মাঝে।

বনহুর বললো,—আপনারা সাবধানে ধীরে ধীরে চলুন। যে সুড়ঙ্গ পথে চলেছেন এপথ হামবার্টের নয় কাজেই আপনারা ধীরে ধীরে চলুন।

আমির আলী সাহেব হাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—এ সুড়ঙ্গ পথ কার তবে?

বনহুর বললো—আমার।

তোমার?

হাঁ। চলুন....

আমির আলী সাহেব আর নীলা পুনরায় চলতে শুরু করে।

বেশ কিছু সময় তারা নীরবে চলতে থাকে। আমির আলী সাহেব আর নীলা অত্যন্ত হাঁপিয়ে পড়েছিলো। ওরা ধীরে ধীরে এগুচ্ছে বনহুরও ওদের সংগে আস্তে আস্তে চলছিলো।

কোন কোন সময় সুড়ঙ্গ পথে ঠেশ দিয়ে ওরা বিশ্রাম করে নিচ্ছিলো।

পিপাসায় নীলার কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছে।

এক সময় বললো নীলা—পানি। একটু পানি দেবে আমাকে?

বনহুরের মায়া হলো কারণ নীলার চলতে বড্ড কষ্ট হচ্ছিলো তারপর পিপাসায় কাতর সে। বনহুর বললো—আরও কিছুক্ষণ কষ্ট করতে হবে। এই সুড়ঙ্গ মধ্যে পানি পাওয়া মুস্কিল।

আবার ওরা চলতে থাকে।

কিন্তু বেশিক্ষণ আর হাটতে সক্ষম হয় না তারা। বসে পড়েন আমির আলী সাহেব। নীলাও ঢলে পড়ে যেন, একে সে ক্লান্ত অবসন্ন তারপর অত্যন্ত পিপাসায় কাতর।

আমির আলী সাহেব বললেন—আর চলতে পারছি না.....একটু ঘুমাবো।

বনহুর বললো—আপনারা ঘুমিয়ে নিন। আমি আবার আসবো।

আমির আলী সাহেব বা নীলা কোন জবাব দেবার পূর্বেই বনহুর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়ে পিতা আর কন্যা।

❑

ভোরে ঘুম ভাংতেই আমির আলী সাহেব চোখ মেলে আশ্চর্য হলেন। তিনি তার বিছানায় শুয়ে আছেন। তার নিজের শয়ন কক্ষ সেটা। কি করে এখানে এলেন ভেবে পাননা।

গত রাতের সমস্ত ঘটনা মনে পড়ে তার। ফিরু গাঁয়ের ডাক বাংলো থেকে হামবার্টের দু'জন অনুচর তাদের বন্দী করে নিয়ে যায় হামবার্টের জংগল বাড়ি ঘাটিতে। তারপর নীলাকে আচমকা আক্রমণ করে বসে হামবার্ট। নীলার তীব্র করুণ আর্তনাদ, আব্বু বাঁচাও..... পরক্ষণেই বিস্ময় ভরা এক অদ্ভুত কাণ্ড। যাদু মন্ত্রের মত আবির্ভূত হলো দস্যু বনহুর। হামবার্টের কবল থেকে উদ্ধার পেলো নীলা। তারপর দস্যু বনহুর আর হামবার্টের মধ্যে তর্ক বিতর্ক। হঠাৎ হামবার্টের পলায়ন পরপর সমস্ত পর্বতমালা কম্পন, প্রচণ্ড একটা শব্দ তার পর ধ্বংসলীলা.....

সব কথা মনে পড়ে আমির আলী সাহেবের, সেই সুড়ংগ পথ, যে পথে দস্যু বনহুর তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিলো। দস্যু বনহুরের অনুগ্রহে তারা পিতা পুত্রি জীবনে বেঁচে আছে। হামবার্ট তাদের সবাইকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে তার জংগল বাড়ি ঘাটির ধ্বংস সুইচ টিপে দিলো চারিদিকে ধ্বসে পড়া পাথর খণ্ডের স্তূপ, তার মধ্য দিয়ে সুড়ংগ পথে অগ্রসর—দস্যু বনহুরের সহানুভূতি সূচক বাণী-------

হঠাৎ আমির সাহেবের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নীলা প্রবেশ করে সেই কক্ষে—আব্বু...

আমির আলী সাহেব বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলেন— মা নীলা তুমি!

আব্বু আমরা এখানে কি করে এলাম?

আমিও তাই ভাবছি মা। সব যেন কেমন যাদু মন্ত্রের মত লাগছে। হাত দু'খানা সম্মুখে মেলে ধরে বলেন আমির আলী সাহেব— হাতের বন্ধনই বা কি করে খুলে গেলো কিছু বুঝতে পারছিনা...

নীলাও তার নিজের হাত দু'খানা সম্মুখে তুলে ধরে দেখতে থাকে এখনও তার হাত দু'খানা লাল হয়ে আছে। কিন্তু সেই বন্ধন গেলো কোথায়, কেইবা তাদের হাত দু'খানাকে মুক্ত করে দিলো।

পিতা পুত্রি মিলে যখন বিস্ময় নিয়ে এ ওর দিকে তাকাচ্ছিলো সেই মুহূর্তে দারওয়ান এসে দাঁড়ায়। লম্বা সালাম দিয়ে বলে— মালিক আপনারা কখন এলেন? আমরা তো কিছু জানিনা।

আমির আলী সাহেব সব কথা গোপন করে বলেন— কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় রাতেই চলে এসেছি।

বৃদ্ধ দারওয়ান মালিকের কথায় খুব সন্তুষ্ট হতে পারলো না কারণ সে সমস্ত রাত সদর গেটে ভালভাবে সজাগ থেকে পাহারা দিয়েছে। কখন গাড়ি গেটে প্রবেশ করলো তারা জানে না এটা আশ্চর্যের বিষয় তবু কোন উত্তর করেনা দারওয়ান, ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে যায় সে।

পরক্ষণেই চাকর বাকর বাবুর্চি সবাই এসে জড়ো হয়, সবার মুখে এক প্রশ্ন মালিক আপনারা কখন এলেন আমরা কেউ জানতে পারলাম না।

যে বাবুর্চি বয় এবং দারওয়ান তাদের সঙ্গে ফিরু গাঁও গিয়েছিলো তারা আসেনি কেনো এ প্রশ্নও করে বসলো চাকর বাকরের দল।

আমির আলী সাহেব প্রথমে বিব্রত হলেন পরক্ষণে নিজকে সামলে নিয়ে বললেন– তারা পরে আসবে কারণ আমরা ভাড়াটিয়া গাড়িতে এসেছি।

মালিকের কথায় আর কেউ প্রশ্ন করে না। সবাই যার যার কাজে চলে যায়।

নীলা এবং আমির আলী সাহেব যতই ভাবেন—ততই অবাক হন কিন্তু কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন না। তবে এটুকু বুঝতে পারেন তাদের এখানে এসেছে দস্যু বনহুর এবং সেই তাদের হাতের বন্ধন উন্মুক্ত করে দিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

সমস্ত দিন কেটে গেলো সন্ধ্যার কিছু পূর্বে রংলাল ফিরুগাঁও থেকে বাবুর্চি বয় এবং দারওয়ান সহ এসে হাজির হলো। রংলালই গাড়ি চালিয়ে এসেছে।

আমির আলী সাহেব রংলালকে দেখে খুশি হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—রংলাল তুমি কখন ডাকবাংলোয় ফিরে এসেছিলে?

রংলাল মাথা চুলকে বললো—বৈকালে গিয়ে দেখি আপনারা নেই দারওয়ান বাবুর্চি বয় সবাই হাত পা মুখ বাধা অবস্থায় দেখতে পাই। মালিক আমি তাড়াতাড়ি ওদের হাত পা এবং মুখের বাঁধন খুলেই দেই। তখন ওরা আমাকে জানায় দু'জন দস্যু এসে আপনাদের ধরে নিয়ে গেছে। কোথায় কোন দিকে নিয়ে গেছে তারা বলতে পারে না। পরে ওদের নিয়ে চলে

এলাম....মালিক আমি কিছু বুঝতে পারছিনা, দস্যু নাকি আপনাদের দুজনাকে পাকড়াও করে নিয়ে গেলো তা হলে এখানে এলেন কি করে!

আমির আলী সাহেব বললেন—সে কাহিনী অতি রহস্যময়। কাউকে না বললেও তোমাকে আমি সব বলবো কারণ আমি এখন এমন একটা বিপদের সম্মুখীন হয়েছি যাতে আমার এবং নীলার জীবনের কোন ভরসা নেই।

অবাক কণ্ঠে বললো রংলাল—মালিক আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

তুমি স্থির হয়ে বসো আমি সব বলছি। কিন্তু এসব কথা আর কাউকে বলবেনা যেন।

না মালিক বলবো না।

আমির আলী সাহেব গত রাতের সব কথা খুলে বলেন রংলালের কাছে আরও বলেন তুমি থাকলে নিশ্চয়ই শত্রু আমাদের এভাবে পাকড়াও করে নিয়ে যেতে পারতো না।

রংলাল বললো—মালিক এখন থেকে আমি সব সময় আপনাদের পাশে পাশে থাকবো।

নীলা ঐ মুহূর্তে পিতার কক্ষে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো তার কানে গেলো রংলালের কথাগুলো আনন্দে ভরে উঠলো ওর মন।

বনহুর পিতার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতেই নীলা ওর পথ রোধ করে দাঁড়ায়—মনির!

নীলা! ওর মুখটা তুলে ধরে রংলাল।

নীলার দু'চোখে অশ্রু ঝরে পড়ে।

রংলাল নীলার চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলে তোমার আব্বুর মুখে সব শুনেছি নীলা! চলো তোমার ঘরে যাই।

চলো! নীলা অগ্রসর হলো।

রংলালও এলো তার সঙ্গে।

নীলা উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদলো কিছুক্ষণ তারপর নিজকে সংযত করে নিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—দস্যু বনহুরের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ মনির কারণ সে যদি ঐ মুহূর্তে জঙ্গল বাড়ি ঘাটির সেই গোপন গুহায় গিয়ে হাজির না হতো তাহলে.....আর বলতে পারে না নীলা।

রংলাল বললো—হাঁ তোমার আব্বুও সে কথা বললেন। তোমরা পিতা কন্যা উভয়েই দস্যু বনহুরের কাছে কৃতজ্ঞ কিন্তু সে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য নিয়েই তোমাদের দু'জনাকে এভাবে উদ্ধার করেছে।

উদ্দেশ্য নিয়ে সে আমাকে এবং আব্বুকে শয়তান হামবার্টের কবল থেকে উদ্ধার করেছে!

তা না হলে সে আবার আসবে বলে গেছে কেনো?

জানিনা তার উদ্দেশ্য কি?

উদ্দেশ্য তুমি.....নীলা তোমাকে সে হয়তো চায়।

মনির।

আমার সে রকম মনে হচ্ছে। ধরো সে তোমাদের জীবন রক্ষা করেছে যদি সে তোমাকে দাবী করে বসে তা হলে কি করবে?

না না তা হতে পারে না।

তোমার আব্বু নিশ্চয়ই তোমার কোন আপত্তি শুনবে না, কারণ দস্যু বনহুর যদি ঐ সময় না গিয়ে পৌছতো তাহলে হামবার্টের কবল থেকে তোমরা রক্ষা পেতেনা কাজেই.....

নীলা রংলালের মুখে হাত চাপা দেয়—চুপ করো, চুপ করো মনির। আমি শুনেছি দস্যু বনহুর বিপদের বন্ধু। সে প্রতিদান চায় না।

একটু হাসলো রংলাল তারপর বললো—কিন্তু আমি শুনেছি সে নাকি ভয়ঙ্কর নর হত্যাকারী এবং নারী হরণ....

মিথ্যা কথা। তুমি যা শুনেছো তা সত্য নয়।

নীলা দস্যু কোনদিন সাধু হয় না। যাক্ সে যদি তোমাদের কাছে সাধু হয় তাহলে ভাল....রংলাল কথা কয়টি বলে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

নীলা বলে...যেও না, শোন।

রংলাল থামলো।

নীলা বললো—তুমি আমার উপর অভিমান করেছো মনির?

উঁ হু।

তবে ওমন করে চলে যাচ্ছো কেনো? দস্যু বনহুর যদি আমাদের উদ্ধার না করতো তাহলে আর কোনদিন তোমার সঙ্গে দেখা হতো না।

জানি।

তবে কেনো তুমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হচ্ছো মনির?

মোটেই আমি অসন্তুষ্ট নই।

তবে হাসো! নীলা রংলালের জামার আস্তিন দু'হাতের মুঠায় চেপে ধরে বলে।

নীলার কথায় রংলালের মুখে হাসি ফুটে উঠে।

নীলা ওর বুকে মুখ রেখে বলে—রংলাল তুমি বুঝবে না আমার কথা। তুমি ছাড়া আমি কিছুই বুঝি না।

নীলা এ তোমার ভুল.....

না ভুল নয়। আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না মনির।
কিন্তু....
বলো?
কিন্তু দস্যু বনহুর যদি....
তুমি ও কথা বলো না। আমাকে আর ব্যথা দিও না।
বেশ আমি তোমাকে ব্যথা দিতে চাই না।
সমস্ত সন্ধ্যাটা নীলা আর রংলাল নানা কথাবার্তায় কাটিয়ে দেয়।
নীলা স্বাভাবিক হয়ে আসে ধীরে ধীরে।

কিন্তু আমির আলী সাহেব ভীষণ আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তিনি সর্বক্ষণ নিজের কক্ষে সাবধানে বসে থাকেন। একটি মুহূর্তের জন্যও আমির আলী সাহেব তার এত সখের গবেষণাগারেও গেলেন না।

যতই রাত বাড়ছে আমির আলী সাহেব ভীত হয়ে উঠেছেন একটা দারুন দুশ্চিন্তার ছাপ তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে।

❑

জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছি শুধু দস্যু বনহুরকে নিঃশ্চিহ্ন করার জন্য। আমি জানতাম সে কত বড় দুর্দান্ত আর ভয়ঙ্কর। সেই দস্যু বনহুর আমাদের ঘাটির সন্ধান পেয়েছিলো....কথা শেষ না করেই হেসে উঠে হামবার্ট—হাঃ হাঃ হাঃ এখন তার সব দর্প সর অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেছে।

হামবার্টের সম্মুখে তার কয়েকজন অনুচর দাঁড়িয়েছিলো, সবার চোখে মুখে একটা বিষণ্নতার ছাপ। যেন তারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে।

হামবার্টের কথায় বললো একজন---মালিক দস্যু বনহুরকে হত্যা করার জন্য আপনি কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি সুনিপুন জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করলেন? এতোবড় ক্ষতি.....

তুমি জানো না মোহনলাল ঐ দস্যুকে হত্যা করার জন্য কান্দাই সরকার কত কোটি কোটি টাকা নষ্ট করেছে। কত পুলিশ গোয়েন্দা অহরহ সন্ধান করে ফিরছে তাকে। আমি সেই বিখ্যাত দস্যু সর্দারকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি আমার একটি ঘাটি বিনষ্ট করে, এ আমার গর্ব।

অপর আর একজন বলে---যে নীলার জন্য আপনি এতো উন্মাদ, সে নীলাও যে মৃত্যুবরণ করলো মালিক?

হাঁ এটা আমার বড় আফসোস মাদার্ন কারণ নীলার প্রতি আমার বহু দিনের অনুরাগ। ওকে আমার নিতান্ত প্রয়োজন ছিলো.....একটু থেমে আবার বললো হামবার্ট।

নীলাকে হারালাম দুঃখ হলেও নীল পাথর আমার বুকে সান্তনা যোগাবে।.....

ঠিক ঐ মুহূর্তে একজন অদ্ভুত পোশাকধারী লোক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়ালো—মালিক খান বাহাদুর ও তার কন্যা নীলা জীবিত...

গুহা মধ্যে যেন আচমকা বাজ পড়লো।

সবাই বিস্ময় নিয়ে তাকালো লোকটার মুখের দিকে।

হামবার্ট বলে উঠলো—খান বাহাদুর আমির আলী সাহেব ও তার কন্যা নীলা জীবিত আছে।

হাঁ মালিক!

তুমি কি করে জানলে গোংলাইসিং?

বিশু সংবাদ এনেছে।

বিশু!

হাঁ মালিক।

এক্ষুণি বিশুকে ডাকো নিশ্চয়ই সে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে।

না মালিক সে নাকি খান বাহাদুর এবং তার কন্যা নীলাকে স্বচক্ষে দেখে এসেছে...

বলো কি গোংলাইসিং! গর্জে উঠে হামবার্ট।

গোংলাই এর মুখ শুকিয়ে গেলো কারণ সে জানে যদি এ কথা মিথ্যা হয় তা হলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এবং সে মৃত্যুদণ্ড অতি ভয়ঙ্কর নির্মমভাবে সংঘটিত হবে। ঢোক গিলে বললো গোংলাই—হাঁ মালিক!

যাও ডেকে আনো!

গোংলাই চলে গেলো।

একটু পরে ফিরে এলো গোংলাইসিং তার সঙ্গে বিশু এসে দাঁড়ালো হামবার্টের সম্মুখে। থর থর করে কাঁপতে থাকে বিশু।

হামবার্ট দাঁতে দাঁত পিষে বলে—যা বলেছো সত্য!

হ্যাঁ মালিক সত্য।

চিৎকার করে উঠে হামবার্ট—মিথ্যে কথা খান বাহাদুর আর নীলা নয় দস্যু বনহুরও নিঃশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

না মালিক তারা নিঃচিহ্ন হয়ে যায়নি ; আমি নিজে চোখে দেখে এসেছি খান বাহাদুর আলী সাহেব এবং তার মেয়ে নীলা কান্দাই শহরে জীবিত আছেন।

না-না এ হতে পারে না। আমি তাদের ধ্বংস করার জন্যই জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস স্তূপে পরিণত করেছি। শুধু তাদের নিঃচিহ্ন করার জন্য....

গুহা মধ্যে দপ দপ করে মশাল জ্বলছে।

হামবার্টের চোখ দু'টো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে! দাঁতে দাঁত পিষছে সে।

বিশু বলে আবার—মালিক সব সত্য কথা।

এবার হামবার্ট কোন কথা বলে না সে ক্ষিপ্তের মত পায়চারী করতে থাকে।

তার অনুচরগণ সবাই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে! না জানি তাদের ভাগ্যে কি আছে। গত রাতে জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস হবার সময় বেশ কিছু সংখ্যক অনুচর নিহত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই! হামবার্ট যখন দস্যু বনহুরকে হত্যা করার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিলো তখন তার কোন কথা স্মরণ করার মত মনের অবস্থা ছিলোনা। সে ক্ষিপ্র গতিতে বেরিয়ে এসেছিলো জঙ্গল বাড়ি ঘাটির বাইরে নির্দিষ্ট এক গোপন গুহায়। সেখানে থেকে জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস করার জন্য ডিনামাইটের মেইন সুইচ-টিপে দিয়েছিলো। এক সঙ্গে পাঁচটি ডিনামাইট বাষ্ট হয়ে ছিলো। প্রচণ্ড শব্দ, তার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলবাড়ি ঘাটি ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছিলো! কে মরলো আর কে জীবিত রইলো ভেবে দেখার সময় ছিলো না হামবার্টের। সেই মুহূর্তে হামবার্ট ভুলে গিয়েছিলো তার কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে মহামূল্যবান ঘাটি ধ্বংসের কথা, দস্যু বনহুর হত্যার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলো সে।

হামবার্ট যখন শুনলো খান বাহাদুর আমির আলী আর তার কন্যা নীলা জীবিত আছে তখন তার সমস্ত শরীরে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিলো। মাথাটা যেন বন বন করে ঘুরে উঠেছিলো সেই মুহূর্তে। হামবার্টের সম্মুখে আচমকা বজ্রপাত হলেও সে এতোখানি চমকে উঠতো না। পাঁচ পাঁচটা ডিনামাইটের বিস্ফোরণ থেকে তারা বাঁচতে পারে এটা কল্পনার বাইরে।

হামবার্ট চিৎকার করে উঠলো—এই মুহূর্তে বিশুকে হত্যা করো।

সঙ্গে সঙ্গে হামবার্টের একজন অনুচর বিশুর বুক লক্ষ্য করে রাইফেল তুলে ধরে গুলি করলো।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে গুহার মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো বিশুর রক্তাক্ত দেহ।

হামবার্ট অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

তারপর হাসি থামিয়ে বললো—মিথ্যা কথার উচিৎ সাজা আমির আলী আর নীলাই শুধু নয় বিখ্যাত দস্যু বনহুরও জীবিত নাই.....জীবিত থাকতে পারে না! একটি নয় দুটি নয় পাঁচটা ডিনামাইটের বিস্ফোরণ সহ্য করা তাঁদের সাধ্য নয়-------হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ .....

হামবার্টের হাসির শব্দে কান্দাই পর্বতমালার গোপন গুহার দেয়ালগুলো যেন থরথর করে কেঁপে উঠলো। সে কি ভীষণ ভয়ঙ্কর পৈশাচিক হাসি।

বললো হামবার্ট—মাদার্ন যাও এক্ষুণি তুমি কান্দাই শহরে চলে যাও। দেখে এসো বিশু যে সংবাদ এনেছিলো তা সত্য না মিথ্যা!

আচ্ছা মালিক আমি এক্ষুণি কান্দাই শহর অভিমুখে রওয়ানা দিচ্ছি।

হাঁ তাই যাও।

বেরিয়ে যায় মাদার্ণ।

লম্বা দোহারা লোকটা, মাথায় লালচে চুল। চোখ দু'টো ঘোলাটে। গায়ের রং সম্পূর্ণ তামাটে। মাদার্ন বাঙ্গালী বা পাঞ্জাবী নয় সে খাটি ইহুদী। ভাল বাংলা জানে। অবশ্য হামবার্টের কাছে যারা আছে তারা বাঙ্গালী না হলেও সবাই ভাল বাংলা বলতে পারে বা বাংলা ভাষা জানে।

মাদার্ন বেরিয়ে গেলো।

হামবার্ট বললো—গোংলাইসিং, শুধু মাদার্ন নয় তুমি অন্য পথে যাও। ছদ্মবেশে যাবে সত্যি যদি খান বাহাদুর আর তার কন্যা জীবিত থাকে তা হলে খান বাহাদুর ও তার কন্যা নীলাকে আবার আমার সম্মুখে নিয়ে এসো। তারপর.....তারপর দাঁতে দাঁত পিষে হামবার্ট চাটার্জী।

চাটার্জী উপাধি গ্রহণ করার জন্য তাকে বাঙ্গালী সাজতে হয়েছিলো। বাংলায় কথা শিখতে হয়েছিলো বেশ কিছুদিন ধরে। অবশ্য বাঙ্গালী জাতিকে হাত করার জন্যই তাকে এই কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল।

গোংলাইসিংও বেরিয়ে গেলো বিনা বাক্যে।

হামবার্ট তার জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস করে কান্দাই পর্বতমালার দক্ষিণে একটি গুহার আস্তানা নিয়েছিলো। সে পূর্ব হতেই এই গুহাটার সঙ্গে জঙ্গল বাড়ি ঘাটির যোগাযোগ রেখেছিলো। এ গুহাটা ছিলো বিরাট বড় এবং ভূগর্ভে। বাইরে থেকে এ গুহা কারো নজরে পড়বে না। পর্বতমালার তলদেশে দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে সেই পথে এ গুহায় প্রবেশ করা যায়।

হামবার্ট এই পথই বেছে নিয়েছিলো তার বিপদ মুহূর্তে নিরাপদে পলায়নের জন্য এবং এই গুহা মধ্যে এমন একটা মেশিন সে তৈরি করে রেখেছিলো যার সুইচ টিপলেই সমস্ত জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু ঐ গুহা বিনষ্ট হবেনা।

এই ভূগর্ভ গুহা মধ্যে হামবার্ট তার গুটি কয়েক সঙ্গী সাথী নিয়ে অবস্থান করছে। সে বুঝতে পেরেছিলো দস্যু বনহুর তার ঘাটির সন্ধান পেয়েছে তখন আর সেখানে তার কাজ চলবেনা তাই হামবার্ট ঘাটি বিনষ্ট করে দস্যু বনহুরকে হত্যা করতে চেয়েছিলো।

বিশুর লাশ তুলে নিয়ে গেলো দু'জন অনুচর।

হামবার্ট এবার তার লৌহ আসনে বসে পড়ে বললো—যদি খান বাহাদুর তার গবেষণাগারে প্রবেশ করে এবং তার কোন মেশিনে হাত দেয় সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাগার ধ্বংস স্তূপে পরিণত হবে। আমি এখান থেকেই সেই সুইচ অন করে রেখেছি....কথা শেষ করেই হামবার্ট উঠে দাঁড়ায়, তার সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বলে—যাও তোমরা তোমাদের কাজে যাও।

মালিকের নির্দেশ পাওয়া মাত্র বেরিয়ে যায় হামবার্টের সঙ্গীগণ। হামবার্ট গুহার মেঝেতে এক জায়গায় পা দিয়ে চাপ দেয় সঙ্গে সঙ্গে একটা গুপ্ত পথ বেরিয়ে আসে, হামবার্ট সেই পথে ভিতরে প্রবেশ করে!

নীচে অদ্ভুত সুন্দর সুসজ্জিত একটি কক্ষ।

কক্ষ হলেও সেটা গুহা বটে কিন্তু ঠিক একটি ঘরের মত দেখতে! মেঝেতে গোলকার একটা টেবিলে। টেবিলে কয়েকটা বিদেশী মদের বোতল। কাঁচপাত্রও রয়েছে বোতলের পাশে।

টেবিলের পাশে একটা লৌহ চেয়ার হামবার্ট সেই চেয়ারে বসে পড়ে তারপর গেলাসের পর গেলাস মদ পান করে চলে।

নেশায় ঢুলু ঢুলু হয়ে উঠে হামবার্ট সে এবার পাশের খাটিয়ায় ধপ করে শুয়ে পড়ে। তারপর মুদে আসে ওর দুটো চোখ।

মাদার্ন তখন তার গাড়ি নিয়ে এলো পাথারী পথে ছুটে চলেছে। পাথুরিয়া উচু নীচু পথে চলতে তার গাড়িখানা এতোটুকু হিমসিম খাচ্ছেনা। শব্দহীন অদ্ভুত জীপ গাড়ি!

গোংলাইসিং ছদ্মবেশেই রওয়ানা দিলো কারণ আমির আলী সাহেব তাকে চেনেন এমন কি নীলাও তাকে দেখেছিলো সেদিন। কাজেই গোংলাই ছদ্মবেশে যাওয়াটাই বাঞ্ছনীয় মনে করলো।

মাদার্ন অবশ্য আমির আলী সাহেবকে চেনে কিন্তু আমির আলী সাহেব মাদার্নকে দেখেনি কোনদিন। নীলা ও মাদার্নকে দেখেনি কোন সময়। তাই মাদানার কোন ছদ্ম বেশের প্রয়োজন হলো না।

আমির আলী সাহেব তার হল ঘরে বসে নীলার সঙ্গে কথা-বার্তা বলেছিলেন। এমন সময় বাইরে একটি গাড়ি এসে থামলো।

রংলাল তার নিজের শয়ন কক্ষ থেকেই দেখতে পেলো গাড়িখানা। সে বেরিয়ে এলো গাড়ি বারেন্দায়।

ততক্ষণে মার্দান নেমে দাড়িয়েছে তার গাড়ি থেকে। রংলালকে লক্ষ্য করে ডাকলো মাদার্ন—এই বয় শোন।

রংলাল প্রথমে যেন শুনতেই পায়নি পরে বললো—আমাকে ডাকছেন সাহেব?

হাঁ শোন সাহেব নয় বলো ভদ্রলোক।

বলুন?

তুমি কি এই বাড়িতে কাজ করো?

আজ্ঞে হাঁ এই বাড়িতে কাজ করি।

কি কাজ করো?

ঘর দুয়ার পরিস্কার করি। খাবার টেবিলে খাবার পরিবেশন করি।

ও বেশ বেশ। তোমাদের মালিক বাসায় আছেন কি?

এবার রংলাল তীক্ষ্ণ নজরে তাকালো মাদার্নের দিকে। পা থেকে মাথা অবধি ভালভাবে লক্ষ্য করে বললো—হাঁ আছেন।

আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো বিশেষ জরুরী কথা আছে।

কিন্তু সাহেব দেখা করবেন কিনা আমি ঠিক বলতে পারছিনা। আপনি অপেক্ষা করুন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে আসছি।

রংলাল চলে গেলো।

একটু পরে ফিরে এলো—আসুন।

মাদার্ন রংলালকে অনুসরণ করলো।

আমির আলী সাহেব এবং নীলা উভয়েই ছিলো সেই কক্ষে।

মাদার্ন সাহেবী কায়দায় ছালাম জানালো মাথায় ক্যাপ খুলে।

আমির আলী সাহেব ছালামের জবাব দিয়ে বললেন বসুন।

মাদার্ন আসন গ্রহন করতেই নীলা বেরিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো।

মাদার্ন সশ ব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আপনি যাচ্ছেন কেন? বসুন—বসুন....

রংলাল বললো—বসুন আপামনি।

নীলা বসলো আবার।

সবার সম্মুখে রংলাল নীলাকে আপামণি এবং আপনি বলেই সম্বোধন করতো।

মাদার্ন কি কথা বলে শুনবার জন্য রংলাল উম্মুখ হয়ে রইলো। সে মিছামিছি নেকড়া দিয়ে টেবিল চেয়ারগুলো মুছতে লাগলো।

মাদার্ন হাতের মধ্যে হাত কছলে বললো—আলী সাহেব আমি হিন্দল থেকে এসেছি। আমরা নতুন্ একটা রবার কোম্পানী খুলছি, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে সেয়ারে কাজ করতে চান তা হলে আমরা খুশি হবো।

আমির আলী সাহেব বললেন—হাঁ আমার ও ঐ রকম একটা ইচ্ছা ছিল কিন্তু সুযোগ সুবিধার অভাবে হয়ে উঠেনি। তা আপনারা যদি আমাকে এ ব্যাপারে সুবিধা দেন তা হলে.....।

নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে আপনি আমাদের কোম্পানীর কাছ থেকে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা পাবেন। আপনার কন্যাও আমাদের কোম্পানী দেখে যথেষ্ট আনন্দ লাভ করবে।

রংলাল কাজের ফাঁকে তীক্ষ্ণ নজরে একবার লোকটার মুখ দেখে নিলো। ওর বলার ভঙ্গী দেখে ভ্রুকুঞ্চিত হলো তার।

লোকটা বলেই চলেছে—আলী সাহেব কান্দাই শহরে আপনার যথেষ্ট নাম আছে তাই আমরা চাই আপনি আমাদের কোম্পানীতে যোগ দেবেন। যদি রাজি থাকেন, তবে কবে কখন আবার আমরা আসবো বলে দিন দয়া করে।

আমির আলী সাহেব বললেন—আজ আমি সঠিক কিছু বলতে পারছিনা। আপনি অন্য একদিন আসুন ঐদিন আমি সব বলবো।

আচ্ছা তাই আসবো ঐ দিন আপনি এবং আপনার কন্যাকে আমি নিয়ে যাবো আমাদের কোম্পানীতে, দেখে অনেক খুশি হবেন আপনারা। হাঁ এই নিন আমার নেম কার্ড.... মাদার্ন ব্যাগ খুলে একটা কার্ড বের করে দিলো আমির আলী সাহেবের হাতে।

আমির আলী সাহেব নেম কার্ডটায় দৃষ্টি বুলিয়ে রেখে দিলেন টেবিলে পেপার অয়েটের নিচে!

মাদার্ন উঠে দাঁড়ালো, পুনরায় মাথার ক্যাপ খুলে সাহেবী কায়দায় ছালাম জানিয়ে বেরিয়ে গেলো। বেরিয়ে যাবার সময় সে একবার তীক্ষ্ণ নজরে নীলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে নিলো।

আমির আলী সাহেব মাদার্নকে গাড়ি অবধি পৌঁছে দিলেন।

মাদার্ন গাড়িতে বসে হাত নাড়লো।

গাড়িখানা বেরিয়ে যাবার পরও আমির আলী সাহেব সেখানে থ' মেরে দাঁড়িয়ে আছেন।

রংলাল এসে কখন তার পিছনে দাঁড়িয়েছে তিনি দেখতে পাননি। ফিরে দাঁড়াতেই বললো রংলাল—মালিক লোকটা আসলে নকল।

ভ্রুকুঁচকে তাকালেন আমির আলী সাহেব রংলাল এর মুখের দিকে বললেন....আমারও কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।

রংলাল বললো—লোকটা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলো মালিক।

নেমকার্ডে যে কোম্পানীর নাম লেখা আছে সে নাম কিন্তু কোনদিন কোন খানে শুনিনি। লোকটার নামও অদ্ভুত ধরনের মিঃ হিংহালা। আমির আলী সাহেব কথাগুলো বলতে বলতে হল ঘরের দিকে এগুলেন।

রংলাল নেমকার্ডখানা নিজেই পড়ে নিয়েছিলো যখন আমির আলী সাহেব বেরিয়ে এসেছিলেন লোকটার সঙ্গে। তাই সে অবাক হলো না এখন নতুন করে।

রংলাল যখন নেমকার্ড খানা পড়ছিলো তখন নীলা তার পিছন থেকে উঁকিদিয়ে বলেছিলো পড়তে পারলে।

উহুঁ! ঠোঁট উল্‌টে জবাব দিয়েছিলো রংলাল।

ওগো অজানা বন্ধু আর কতদিন আমার সঙ্গে তুমি অভিনয় করবে। বলেছিলো নীলা।

নীলার কথায় রংলালের মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে পড়ছিলো।

নীলা হেসে বলেছিলো—দুষ্ট তুমি।

বনহুর হেসেছিলো কোন জবাব দেয়নি।

আমির আলী সাহেব হলঘরে প্রবেশ করতেই রংলাল বাগানের দিকে এগুলো। বাগানে নানা রকম ফুলের সমারোহ। রংলাল কতকগুলো ফুল তুলে নিয়ে বাগান থেকে যেমন বেরুতে যাবে অমনি একটি সাপুড়ে সাপের ঝুড়ি কাঁধে ফটকের পাশে এসে ডেকে বললো—সাপ খেলা দেখবেন বাবু—সাপ খেলা....

রংলাল কিছু বলবার আগেই নীলা রিলিং এর পাশে থেকে হাত নেড়ে বললো—ভিতরে এসো।

দারওয়ান গেট খুলে দিলো।

সাপুড়ে ফটকের ভিতরে প্রবেশ করলো।

নীলার পাশে এসে দাঁড়ালো রংলাল।

নীলা সাপুড়েকে লক্ষ্য করে বললে—খেলা দেখাও। তারপর রংলালের মুখে তাকিয়ে একটু হাসলো সে।

সাপুড়ে সাপের ঝুড়ি বের করলো কিন্তু ঝুড়ি না খুলেই বললো—সাপ খেলা দেখলে আমি যা বখশীস চাইবো তাই দিতে হবে।

রংলাল বললো—কি চাও তুমি?

ঐ যুবতীর আংগুলে অংগুরী আছে ওটা আমাকে দিতে হবে।

নীলা নিজের হাতের অংগুরীর দিকে তাকালো।

রংলাল বললো—ওর আংগুলের অংগুরী দিতে হবে—বলো কি সাপুড়ে!

হাঁ সাহেব, না হলে আমি সাপ খেলা দেখাই না।

নীলা বলল—বেশ আমি তাই দেবো।

রংলাল বলে উঠলো—নীলা।

তুমি আমাকে বারণ করো না মনির, আমি সাপ খেলা দেখবোই।

বেশ! গম্ভীর মুখে বললো রংলাল।

সাপুড়ে সাপ খেলা দেখানো শুরু করলো। বিরাট অজগর; নড়তে পারে না সাপটা, তবু সাপুড়ে ঐ সাপ নিয়ে নানাভাবে গলায় জড়িয়ে কাঁধে তুলে খেলা করতে লাগলো।

নীলার দু'চোখ বিস্ময়।

এমন বিরাট সাপ সে কোনদিন দেখেনি।

সাপ খেলা দেখে শুধু অবাকই হলো না নীলা, বিস্ময় বিমূঢ় হলো, নিজের আংগুল থেকে অংগুরীটা খুলে দিয়ে দিলো সে সাপুড়ের হাতে।

রংলাল ওকে কিছু বললো না।

সাপুড়ে চলে গেলো।

রংলাল আর নীলা ফিরে এলো তাদের নিজ নিজ কক্ষে।

রংলাল কক্ষ মধ্যে পায়চারী করতে লাগলো, একটা গভীর চিন্তা তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কিছু পূর্বে সেই অদ্ভুত বেশধারী রবার কোম্পানীর লোকটা এবং এই সাপুড়ে তার মনকে ভাবিয়ে তুলেছে। নিশ্চয়ই এরা স্বাভাবিক বা সাধারণ নয়। নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এরা এসেছিলো। আমির আলী সাহেব এবং নীলাকে এখানে রাখা মোটেই উচিৎ হবে না।

রংলাল অনুমান করে নিলো এরা হামবার্টের লোক এবং আমির আলী সাহেব ও নীলার সন্ধানেই তাঁরা কান্দাই এসেছিলো।

হঠাৎ আমির আলী সাহেব এবং নীলাকে এ সব কথা সে বলতে পারে না, তারা তাকেই সন্দেহ করে বলতে, পারে। কিন্তু এদের যেমন করে হোক সরাতেই হবে।

নীলা নিজ হাতের আংগুল থেকে অংগুরী খুলে দেবে এটা রংলাল ভাবতে পারেনি। নীলা যে মস্ত ভুল করলো তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এখন কি করবে রংলাল ভাবতে লাগলো। তবে আজ রাতেই এদের এ বাড়ি থেকে সরানো দরকার।

গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেংগে গেলো আমির আলী সাহেবের চোখ মেলতেই সম্মুখে দেখলো সেই লোক, জমকালো পোশাক পরা....স্বয়ং দস্যু বনহুর।

আমীর আলী সাহেব আমতা আমতা করে বললেন--- আপনি....আপনি....

আপনি নয় তুমি।

তুমি আসবে বলেছিলে.....

হাঁ... তাইতো এসেছি। শুনুন খান বাহাদুর সাহেব সুচতুর হামবার্ট আপনাদের পিছু ছাড়েনি এখনও, কাজেই এখানে থাকা আপনাদের মোটেই নিরাপদ নয়। তাই আমি এসেছি আজ রাত ভোর হবার পূর্বেই আপনি এবং নীলা এ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যান।

ঢোক গিলে বলেন আমীর আলী সাহেব—তুমিই বলে দাও, আমরা কোথায় যাবো? কোথায় গেলে হামবার্টের কবল থেকে রক্ষা পাবো?

একটি গাড়ি আপনার বাড়ির পূর্বদিকের রাস্তায় অপেক্ষা করবে, আপনারা মানে আপনি এবং নীলা ঐ গাড়িতে বসবেন। গাড়ির ড্রাইভার আপনাদের ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে।

কিন্তু.....

কোন কিন্তু নয় আপনি আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না। দস্যু বনহুর যেমন আচমকা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করেছিলো তেমনি হঠাৎ বেরিয়ে গেলো।

আমির আলী স্থবীরের মত বসে রইলেন, দস্যু বনহুরের কাছে আরও অনেক প্রশ্ন করার ছিলো কিন্তু তা আর হলো না। তিনি কি করবেন যেন ভেবে পাচ্ছেন না।

দস্যু বনহুরের গম্ভীর কণ্ঠস্বর তার কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল...কোন কিন্তু নয় আপনি আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না.... আপনার বাড়ির পূর্বদিকের রাস্তায় একটি গাড়ি অপেক্ষা করছে আপনি আর নীলা ঐ গাড়িতে গিয়ে বসবেন...ড্রাইভার আপনাদের ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে...

আমীর আলী সাহেব আর এক দণ্ড দেরী করলেন না, তিনি তার বিশাল ঐশ্বর্যের মায়া বিসর্জন দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কারণ, জীবনের কাছে ঐশ্বর্য কিছু নয়। দস্যু বনহুর তাঁকে নিশ্চয়ই মন্দ পরামর্শ দেয় নি। সে যে একজন হিতাকাঙ্খী তাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমির আলী সাহেব তাড়াতাড়ি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে নীলার কক্ষে প্রবেশ করে ডাকলো—মা নীলা। নীলা!

পিতার চাপা এবং উদ্বিগ্ন ভরা কণ্ঠস্বরে নীলার নিদ্রা ছুটে যায়, বিছানায় উঠে বসে বলে—আব্বু!

ব্যস্ত কণ্ঠে বলেন আমির আলী সাহেব—নীলা শীঘ্র উঠে পড়ো এক্ষুণি এ বাড়ি ছেড়ে আমাদের পালাতে হবে।

আব্বু এ তুমি কি বলছো?

হাঁ মা আর এক মুহূর্ত দেরী করা উচিৎ হবে না।

আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না আব্বু?

মা একটু পূর্বে স্বয়ং দস্যু বনহুর আমার কক্ষে প্রবেশ করেছিলো।

দস্যু বনহুর আবার এসেছিলো বলো কি আব্বু?

হাঁ সেই তো বলে গেলো আপনি এবং নীলা এদণ্ডে এই বাড়ি ত্যাগ করুন যদি হামবার্টের কবল থেকে রক্ষা পেতে চান মা আর দেরী করোনা, উঠে পড়ো।

কিন্তু এতো রাতে আমরা কোথায় যাবো আব্বু?

সে চিন্তা আমাদের করতে হবে না নীলা দস্যু বনহুর আমাদের রক্ষার দায়িত্বভার নিয়েছে।

দস্যু বনহুর আমাদের রক্ষার দায়িত্ব ভার নিয়েছে এ-কি কথা বলেছো আব্বু? সে যে কি মতলবে আমাদের পিছু নিয়েছে সেই জানে। আমি কিন্তু তাকে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতে পারছিনা।

নীলা তুমি ভুল করছো, যে আমাকে এবং তোমাকে নর-শয়তান হামবার্টের মত পিশাচের কবল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে তাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারছো না!

না আব্বু! কারণ সে কি জন্য আমাদের প্রতি এমন সহানুভূতিশীল হলো ঠিক বুঝতে পারছি না।

এতো ভাববার সময় কই মা শীঘ্র উঠে পড়! দেখা যাক কি হয় .... একটু থেমে বললেন আমির আলী সাহেব—আমরা এমন একটা বিপদের

সম্মুখীন হয়েছি যার কোন তুলনা হয় না নীলা। হামবার্ট একদিন আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলো আর আজ সেই আমার যম– আমার মৃত্যুদূত। নীলা দস্যু বনহুরের হাতে জীবন দেওয়া তবু শ্রেয় হামবার্টের হাতে নয়। মা উঠে পড় আর এক মুহূর্ত দেরী করিস না।

বেশ বলো কিন্তু রংলালকে সঙ্গে নিতে হবে।

তা হয় না মা। এটা আমরা সখের জন্য বেড়াতে যাচ্ছি না।

আব্বু রংলাল সঙ্গে থাকলে অনেক অনেক ভাল হবে। সে অসীম সাহসী....

তবু হয় না নীলা। দস্যু বনহুর এ ধরনের কিছু বলেনি।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একখানা ছোরা এসে গেঁথে গেলো খাটের সঙ্গে।

চমকে উঠলেন আমীর আলী সাহেব এবং নীলা। ছোরার বাটে একখানা চিঠি গাঁথা আছে দেখতে পেলো তারা। আমির আলী সাহেব ছোরাখানা হাতে তুলে নিয়ে চিঠিখানা খুলে মেলে ধরলেন চোখের সামনে—

—আলী সাহেব আপনি এবং নীলা

এই মুহূর্তে বাড়ি ত্যাগ করুন।

—দস্যু বনহুর

আমির আলী সাহেব চিঠিখানা নীলার হাতে দিয়ে বলেন—দেখ মা দেখ্ পড়ে দেখ কাগজের টুকরাখানা।

নীলার দু'চোখে ভয় বিস্ময় ঝরে পড়ছে। সে চিঠির দু'ছত্র লেখার উপরে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো—চলো আব্বু। গলাটা যেন চাপা কান্নায় ভরে উঠেছে ওর।

আমির আলী সাহেব এবং নীলা রাতের অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নীচে। আমির আলী সাহেবের মুখ ফ্যাকাশে মলিন-বিমর্ষ, নিজের বাড়ি থেকে তাকে চোরের মত পালাতে হচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে তিনি নিজেই জানেন না।

বিশাল ঐশ্বর্যের অধিপতি আমির আলী সাহেব আজ রিক্ত নিঃস্ব অসহায় অবস্থায় শুন্য হাতে পালিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। আশ্চর্য ফটকে দারওয়ান পর্যন্ত নেই, এরা সব গেলো কোথায় তবু তার মুখ দিয়ে আজ কোন কথা বের হলো না। সোজা ফটক পেরিয়ে পিতা পুত্রি এগুলো বাড়ির পূর্বদিকের রাস্তা ধরে।

কিছুটা এগুতেই তাদের নজরে পড়লো একটি গাড়ি রাস্তার উপরে অপেক্ষা করছে।

আমির আলী সাহেব এবং নীলা বাড়ির পাশে এসে দাঁড়াতেই ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

গাড়িতে চেপে বসলো তারা।

ড্রাইভার গাড়ি ছাড়লো।

জনশূন্য প্রশস্ত রাজপথ বেয়ে উল্কা বেগে গাড়ি ছুটে চললো।

আমির আলী সাহেব এবং নীলা গাড়ির পিছন আসনে বসে থাকে পুতুলের মত আড়ষ্ট হয়ে। পিতা পুত্রি কারো মুখে কোন কথা নেই। তারা যেন কোন অজানার পথে এগিয়ে চলেছে।

বহুক্ষণ ধরে গাড়ি চললো।

এ পথ সে পথ ধরে গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। রাতের অন্ধকার হলেও লাইট পোষ্টের আলোতে পথ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নীলা এপথ চিনতে পারলো না।

আমির আলী সাহেব কেমন যেন তন্দ্রাচন্নের মত হয়ে পড়েছেন কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না তিনি।

কতক্ষণ কেটে গেলো।

গাড়িখানা এক সময় এসে থামলো একটি ছোট গলির মুখে।

গলিটা বহু পুরোন তাতে কোন সন্দেহ নাই।

গলির মধ্যে জমাট অন্ধকার?

শিউরে উঠলো নীলা।

আমির আলী সাহেবের কণ্ঠনালী বেশ শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছে। তিনি রীতিমত ঘাবড়ে গেছেন একেবারে!

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

আমির আলী সাহেব নেমে দাঁড়ালেন।

নীলা গাড়ি থেকে নামতে নারাজ বলে মনে হলো।

আমির আলী সাহেব কম্পিত গলায় বললো—নেমে আয় নীলা।

নীলা এবার না নেমে পারলো না।

আমির আলী সাহেব আর নীলা যখন গাড়ি থেকে অন্ধকারে গলির মুখে নেমে দাঁড়ালো তখন ড্রাইভার নীরবে অগ্রসর হলো। আমির আলী সাহেব আর নীলা তাকে অনুসরণ করলো।

গলির মধ্যে একে অন্ধকার তারপর আবর্জনাভর্তি দুর্গন্ধময়। নীলার নাড়ি ভুড়ি যেন বেরিয়ে আসতে চায় তবু সে এ বিপদ মুহূর্তে নাকে রুমাল চাপা দেবার কথা ভুলে যায়।

নীলা আমির আলী সাহেবকে ধরে এগুতে থাকে।

ড্রাইভার সম্মুখে এগুচ্ছে।

অন্ধকারে তাদের চলতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো। এ গলির মধ্যে কোন লাইট পোষ্ট না থাকায় অন্ধকার জমাট হলেও পথ দেখা যাচ্ছিলো এবং ড্রাইভারকেও নজরে পড়ছিলো।

বেশ কিছুদূর এগুনোর পর একটা বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লো ড্রাইভার।

আমির আলী সাহেব এবং নীলাও থেমে পড়লো। মুখমণ্ডল তাদের দেখা না গেলেও বেশ বোঝা যাচ্ছে তাদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

ড্রাইভার দরজার পাশে একটি বোতামে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেলো। ভিতরেও বাইরের মত অন্ধকার।

ড্রাইভার দরজার ভিতর প্রবেশ করলো। আমির আলী সাহেব এবং নীলা তাকে অনুসরণ করে দরজার মধ্যে ঢুকে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

নীলা চমকে উঠলো ভীষণভাবে।

আমির আলী সাহেবের অবস্থাও তাই। তিনি যন্ত্রচালিত পুতুলের মত এগিয়ে চললেন।

কিছুটা এগুনোর পর একটি সুড়ঙ্গ পথ পেলেন তারা। সেই পথে ড্রাইভার এগুতে লাগলো।

আমির আলী সাহেব এবং নীলাও তাকে অনুসরণ করে চললো।

বেশ কিছুটা চলার পর একটি লিফ্‌ট সম্মুখে দেখতে পেলো আমির আলী সাহেব আর নীলা।

ড্রাইভার লিফটে উঠে দাঁড়াল।

আমির আলী সাহেব আর নীলাও লিফটে চেপে পড়লো। অবশ্য এ ছাড়া তাদের কোন উপায় ছিলো না তখন। যা তাদের ভাগ্যে আছে তাই ঘটবে, তবু হামবার্টের নিকট আত্মসর্মপণ করবে না। তবে আশ্চর্যও তারা কম হয়নি কারণ অন্ধকার অপরিচ্ছন্ন একটি গলিতে তেমনি অপরিচ্ছন্ন একটি বাড়ির মধ্যে এমন ধরনের পথ আছে বা লিফ্‌ট রয়েছে এটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

আমির আলি সাহেব এবং নীলার বিস্ময় না কমতেই একটি উজ্জল আলো তাদের চোখ বাঁধিয়ে দেয়। লিফ্‌ট খানা থেমে পড়েছে। সুন্দর একটি কক্ষ।

লিফ্‌ট থেকে ড্রাইভার নেমে পড়লো।

আমির আলী সাহেব আর নীলাও নেমে দাঁড়ালো। সম্মুখে তাকিয়েই চমকে উঠলো আবার তারা।

একটি আসনে উপবিষ্ট স্বয়ং দস্যু বনহুর।

নীলার বুকটা কেঁপে উঠলো তার অজান্তে।

আমির আলী সাহেব ভীত না হলেও তিনি যে বেশ হকচকিয়ে গেছেন তা তার মুখমণ্ডল দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে। নীলা পিতার পাশে ঘনিষ্ট হয়ে দাঁড়ালো।

ড্রাইভার দস্যু বনহুরকে কুর্নিশ জানিয়ে চলে গেলো।

এই এতোটা পথ ড্রাইভারের সঙ্গে তারা এসেছে এর মধ্যে ড্রাইভার তাদের সঙ্গে একটি কথাও বলেনি।

নীলার মনে ব্যাপারটা বেশ দাগ কেটে যাচ্ছিলো কিন্তু কিছু বলতে সাহসী হয়নি সে।

ড্রাইভার চলে গেলো!

আমির আলী সাহেব আর নীলা দাঁড়িয়ে আছে ঠিক পাশাপাশি দুটি মূর্তির মত।

দস্যু বনহুর এবার আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো। তার দেহে এখন সেই জমকালো পোশাক! মাথার পাগড়ির আঁচল দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢাকা। পায়ে ভারী বুট, কোমরের বেলটে রিভলভার এবং ছোরা। এগিয়ে এলো বনহুর কয়েক পা তারপর বললো—বড্ড ঘাবড়ে গেছেন আপনারা। কিন্তু ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই।

নীলার দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়, কয়েক ঘন্টা পূর্বে নীলার কক্ষে যখন তার আব্বুর সঙ্গে কথা হচ্ছিলো তখন একটি ছোরা এসে এসে খাটের গায়ে বিদ্ধ হয়! ছোরাখানায় একটি চিঠি গাঁথা ছিলো, চিঠিখানা লিখে ছিলো দস্যু বনহুর। আর সেই দস্যু বনহুর এখানে তাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান।

নীলা নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখছিলো দস্যু বনহুরকে।

আমির আলী সাহেব বললেন এবার—না না ঘাবড়ে যাইনি। ঘাবড়ে যাইনি! তুমি যখন আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছো তখন

আর ঘাবড়াবার কি আছে। সত্যি বলতে কি এখন আমি নিজকে অনেকখানি নিশ্চিন্ত মনে করছি.....

হাঁ আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। যান ঐ যে দরজা দেখছেন ওদিক দিয়ে ভিতরে চলে যান।

আমির আলী সাহেব ওদিকের দরজার দিকে পা বাড়ান।

নীলাও তাকে অনুসরণ করে।

বনহুর বলে— আপনি এদিকের দরজা দিয়ে ভিতরে চলে যান মিস নীলা।

দস্যু বনহুরের মুখে নিজের নাম শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো নীলা, তাকালো সে ওর চোখ দুটোর দিকে।

বনহুর হেসে বললো—এদিকে যান।

নীলা এবার বাধ্য হলো বনহুরের কথা মত এগুতে। আমির আলী দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতেই দু'জন লোক এগিয়ে এলো তারা তাকে বললো—আসুন আমাদের সঙ্গে।

আমির আলী সাহেব বাধ্য হলেন লোক দু'জনকে অনুসরণ করতে!

কয়েকটা ঘর পেরিয়ে একটা সুসজ্জিত ঘরে এসে দাঁড়ালো লোক দু'জন। তাদের মধ্যে একজন বললো—এ কক্ষ আপনার জন্য। আপনি যা প্রয়োজন সব এখানে পাবেন।

বেরিয়ে গেলো লোক দু'জন।

আমির আলী সাহেব কক্ষ মধ্যে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। কক্ষের মধ্যে তার প্রয়োজনীয় সব কিছুই রয়েছে। এমন কি যে চুরুট তিনি পান করেন সেই চুরুটও টেবিলে সাজানো আছে। আলী সাহেব বিস্মিত হলেন দস্যু বনহুর কি করে জানালো তিনি কোন জাতীয় ধূমপান করেন।

ঠিক নীলার অবস্থাও তাই।

নীলা ভয় কম্পিত পদক্ষেপে অপর দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতেই দুজন লোক তাকে স্বসম্মানে অভ্যর্থনা জানালো। একজন বললো—আসুন আমাদের সঙ্গে।

নীলা কোন জবাব না দিয়ে লোক দু'জনকে অনুসরণ করলো। যদিও লোক দুজনকে দেখে তার হৃদপিণ্ড ধক্ ধক্ করছিলো। এরা যে স্বাভাবিক সাধারণ লোক নয় তা তাদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। বলিষ্ঠ জোয়ান

দেহ, শরীরে জমকালো পোশাক, গোঁফ জোড়া এবং চোখ দুটো দেখলেই মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়।

নীলা বুঝতে পারে এরা দস্যু বনহুরের অনুচর!

কিন্তু এদের ব্যবহারে নীলা কোন ত্রুটি খুঁজে পায়না। নীলাকে এরা সঙ্গে করে নিয়ে আসে একটি সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষে। কক্ষটা আধুনিক রুচী সম্মত ভাবে সাজানো।

নীলা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে থ' মেরে গেলো যেন। সুন্দর পরিষ্কার বিছানার উপর নরম দুটি বালিশ। ধপ ধপে মশারী খাটানো রয়েছে এমন কি আলনায় বেশ কয়েক খানা শাড়িও ভাঁজ করা রয়েছে।

ও পাশে ড্রেসিং টেবিলে সুন্দর করে সাজানো প্রসাধনী সামগ্রী। কোনটাই বাদ যায়নি যেন।

নীলা যখন বিস্ময় নিয়ে এসব দেখছে। তখন পিছনে সেই কণ্ঠস্বর—মিস নীলা এ কক্ষ আপনার জন্য।

চমকে ফিরে তাকালো নীলা।

দস্যু বনহুর কখন তার পিছনে এসে দাড়িয়েছে।

নীলা লোক দুটির সন্ধানে এ পাশ ও পাশে তাকায়। এ মুহূর্তে ঐ লোক দুজনকেই তার ব্যাকুল আঁখি যেন খুঁজে ফেরে। সম্পূর্ণ নির্জন কক্ষে দস্যু বনহুরকে যেন সে সহ্য করতে পারছিলো না।

বনহুর নীলার ভীত আতঙ্কিত মুখভাব লক্ষ্য করে বলে—ওরা চলে গেছে। কি প্রয়োজন বলুন মিস নীলা আমি আপনার আদেশ পালন করতে বাধ্য আছি!

নীলার দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠে, ভয় কম্পিত কণ্ঠে বলো—না না আমার কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। তুমি যাও চলে যাও দস্যু বনহুর।

একটু হেসে বলে বনহুর—চলে যাবো কোথায়? এ সবই যে আমার মিস নীলা, কাজেই....

না না আমি কান কথা তোমার শুনতে চাই না। তুমি যাও। চলে যাও এখান থেকে...

বেশ যাচ্ছি কিন্তু আবার আসবো। এখন আপনি বিশ্রাম করুন মিস নীলা।

বনহুর বেরিয়ে যায়।

নীলা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে ফিরে আসে বিছানার পাশে। সমস্ত মুখখানা তার বিষণ্ন মলিন হয়ে পড়েছে। সে বিছানায় বসে পড়ে তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

❑

বোমার মত ফেটে পড়ে হামবার্ট—মাদার্ন তুমি নিজে দেখে এসেছো আমির আলী আর নীলা জীবিত আছে এবং তাদের বাস ভবনে রয়েছে।

হাঁ মালিক আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি তারা জীবিত আছে এবং কান্দাই আমির আলী সাহেবের নিজ বাসভবনে অবস্থান করছে। কথাগুলো বলে থামলো মাদার্ন।

তুমি কি ভাবে সেখানে গিয়েছিলে মাদার্ন তার বর্ণনা দাও?

আমি রবার কোম্পানীর এজেন্ট এর বেশে সেখানে যাই এবং স্বয়ং আমির আলী সাহেবের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করি। আমি তাঁকে আর কন্যা নীলাকে আমাদের কোম্পানী দেখে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে এসেছি।

চমৎকার বুদ্ধি এঁটেছিলে মাদার্ন। কোম্পানী দেখতে এলেই আমার হাতের মুঠায় এসে যাবে তারা। তারপর যাবে কোথায়.... কিন্তু আমি ভাবছি আর একটি কথা দস্যু বনহুর গেলো কোথায়। আমির আলী এবং নীলার পিছনে রয়েছে এই ভয়ঙ্কর দস্যুটা না হলে এরা বাঁচতে পারতো না কিছুতেই। এই দস্যু বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই দেখছি....

মাদার্ন বলে উঠে—মালিক আপনি কি তাহলে মনে করেন দস্যু বনহুর জঙ্গল বাড়ি ঘাটির ধ্বংস স্তূপ থেকে বেঁচে গেছে?

হাঁ। সে যদি না বাঁচতো তাহলে আমির আলী আর নীলা বাঁচতো না। দস্যু বনহুরই কোনক্রমে এদের বাঁচিয়ে নিয়েছে।

মালিক একেবারে যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

ঐ ভয়ঙ্কর দস্যুর অসাধ্য কিছু নেই একথা তোমাদের আমি পূর্বেই বলেছি। সব আমার ব্যর্থ হয়েছে মাদার্ন সব আমার ব্যর্থ হয়েছে....একটু থেমে আবার বলে হামবার্ট—জীবনের সব প্রচেষ্টা আমি ধ্বংস করে ফেলেছি শুধু ঐ দস্যু বনহুরকে ধ্বংস করার জন্য। হামবার্ট নিজের মাথার চুলগুলোও টেনে ছিঁড়তে থাকে।

মাদার্ন বলে বলে উঠে—মালিক আমির আলী আর নীলার প্রতি তার এ অনুরাগ হলো কি করে ভেবে পাচ্ছি না! এদের রক্ষা করে তার লাভ কি?

মাদার্ন তুমি জানো না ঐ দস্যু বনহুর কত চরিত্রহীন। নীলার মত সুন্দরী নারী, কার না লোভ হয়। দস্যু বনহুর নীলার প্রতি আসক্ত হয়েছে এবং সেই কারণেই পিতা পুত্রীকে রক্ষার জন্য সে উঠে পড়ে লেগে গেছে। কিন্তু অপদার্থটা জানে না নীলাকে সে কোন দিন পাবে না কারণ নীলা আমার।

মালিক তাছাড়া নীলা তো ভালবাসে ঐ রংলালটাকে। সেদিনও আমি দেখেছি রংলালকে তার পাশে।

তাচ্ছিল্য ভরে হেসে বলে হামবার্ট—ও চুনে পুটির জন্য আমি মোটেই ভাবি না। ওকে যে কোন মুহূর্তে আমি টিপে মেরে ফেলতে পারবো। যত সমস্যা হলো ঐ দস্যু বনহুর... কিছুক্ষণ ঘন ঘন পায়চারী করে সে তারপর বলে—মাদার্ন তোমার কথা সব সত্য তো?

হাঁ মালিক।

গোংলাইসিং এলোনা এখন পর্যন্ত....

কথা শেষ হয় না হামবার্টের গোংলাইসিং এসে দাঁড়ায় লম্বা সেলুট ঠুকে।

হামবার্ট বলে—কে তুমি?

গোংলাই সাপুড়ে বেসেই এসেছিলো তাই হামবার্ট বা মাদার্ন তাকে চিনতে না পেরে চমকে উঠেছিলো। এবার গোংলাই তার নকল গোফ এবং গালে বড় আঁচলটা খুলে ফেলে তার সঙ্গে খুলে ফেলে মাথার পাগড়িটা।

হামবার্ট বলে—তোমার প্রবেশ কেনো গোংলাইসিং?

মালিক এবেশ নিয়েই আমি গিয়েছিলাম কান্দাই শহরে খান বাহাদুর আমির আলি স্যাহেবের বাস ভবনে!

চমৎকার! সাপুড়ের বেশে গিয়েছিলে।

হাঁ! হাঁ মালিক।

কি খবর বলো।

আমির আলী এবং তার মেয়ে জীবিত আছে দেখে এলাম।

প্রমাণ কিছু এনেছো?

হাঁ আমি প্রমাণ এনেছি মালিক। এই দেখুন.....পকেট থেকে নীলার আংগুলের আংটিটা বের করে হামবার্টের দিকে বাড়িয়ে ধরে গোংলাইসিং।

হামবার্ট এর মুখ খানা নর শয়তানের মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে, খুশি হয়ে হাত বাড়িয়ে গোংলাই এর হাত থেকে আংটিটা নিয়ে চোখের সামনে মেলে

ধরে বলে—নীলা তোমার সাপ খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে এ অংগুরী পুরস্কার দিয়েছে বুঝি?

হাঁ মালিক।

তা হলে ওরা পিতা পুত্রী উভয়েই মনের আনন্দে দিন কাটাচ্ছে।

শুধু ওরা নয় ওদের সঙ্গে রয়েছে সেই জংলী যুবকটা, যার প্রেমে আত্মহারা নীলা রাণী।

ঠিক বলেছো গোংলাই নীলা ঐ জংলীটার প্রেমে আত্মহারাই বটে। কিন্তু ওকে আমি গ্রাহ্য করিনা যে কোন মুহূর্তে রংলাল ছোকরাটাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলতে পারবো। এখন কাজের কথা বলো মাদার্ণ আর গোংলাইসিং? কাজের কথা বলো?

মালিক বলুন!

কাজ হলো—এক নম্বর খান বাহাদুর আর নীলাকে কান্দাই শহর থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা। দুই নম্বর হলো—খান বাহাদুর আমির আলীর গবেষণাগার ধ্বংস করা। তিন নম্বর হলো—জংলী যুবক ঐ নেংটি ইঁদুর রংলালটাকে খতম করা তারপর চার নম্বর হলো দস্যু বনহুরের সঙ্গে মোকা বেলা করা।

মাদার্ন আর গোংলাইসিং প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠলো—দস্যু-বনহুরের সঙ্গে মোকাবেলা মালিক আপনি করবেন, বাকি তিন নম্বর পর্যন্ত সব কাজ করবো আমরা।

গর্দভ তাছাড়া আর কি পারবে তোমরা। হাঁ এবার শোন মাদার্ন তুমি আমির আলী সাহেব আর নীলাকে কোম্পানী দেখার নাম করে কান্দাই পর্বত মালার পাদমূলে নিয়ে আসবে তারপর আমার কাছে।

আচ্ছা মালিক আপনার আদেশ মতই কাজ করবো। বললো মাদার্ন।

এবার হামবার্ট গোংলাইসিংকে লক্ষ করে বললো—গোংলাই তুমি রংলালকে হত্যা করে তার মাথাটা নিয়ে আসবে। আমি তার মাথা চাই। আর আমির আলীর গবেষণাগার ধ্বংস করবো আমি সে চাবিকাঠি আমার হাতে আছে।

গোংলাইসিং বললো—রংলাল এর মাথাটা আজই নিয়ে আসতে পারতাম মালিক কিন্তু এই সামান্য কাজের জন্য আমি বিলম্ব করিনি। যে কোন সময় আমি রংলালের মাথা নিয়ে হাজির হবো।

যে কোন দিন হলে চলবে না? রংলালের মাথা আমি দু'দিনের মধ্যেই চাই।

আচ্ছা মালিক।

এবার তোমরা যাও।

মাদার্ন আর গোংলাই চলে গেলো।

হামবার্ট পাশের একটি বেলে আংগুল রাখলো সংগে সংগে একজন নীল পোশাকধারী লোক এসে দাঁড়ালো—আদাব মালিক।

হামবার্ট বললো—এক নম্বর হিপিংকার বের করো।

আচ্ছা মালিক। কথাটা বলে চলে গেলো লোকটা।

হামবার্ট তার শয্যার পাশে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো। টেবিলে একটি বোতামে চাপ দিতেই টেবিলটার মধ্যে একটি ছিদ্র পথ বেরিয়ে পড়লো। হামবার্ট ঐ ছিদ্র পথে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো নিচে। সুন্দর একটি সুড়ঙ্গ পথ কিছুদূর এগুতেই একটি কক্ষ। সেই কক্ষ মধ্যে প্রায় বিশ পঁচিশ জন লোককে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে।

হামবার্ট কক্ষের মেঝেতে এসে দাঁড়াতেই দুজন এ প্রাণ পরা লোক এসে দাঁড়ালো হামবার্টের দু'পাশে।

হামবার্ট কিছু ইংগিৎ করে কক্ষের এক পাশে একটি টেবিলের ধারে এসে দাঁড়ালো।

একজন লোক একটি এপ্রোন এনে বেঁধেদিলো হামবার্টের শরীরে।

টেবিলটার আশে পাশে নানারকম অস্ত্রসস্ত্র সাজানো ছিলো। আকারে টেবিলটা ঠিক অপারেশন টেবিলের মত। টেবিলের উপরে পাওয়ার ফুল বাল্ব ঝুলছে।

কক্ষের চার পাশের দেয়ালে নানারকম যন্ত্রপাতি আর মেশিন রয়েছে। কক্ষটাকে প্রথম দর্শনে অপারেশান থিয়েটার বলেই মনে হবে।

আসলেও তাই, এটা শয়তান হামবার্টের অপারেশান কক্ষ। এখানে সে নিরীহ মানুষ ধরে এনে হৃদপিণ্ড তুলে নিয়ে অপর একজনের হৃদপিণ্ড সংযোগ পরীক্ষা চালায়। চক্ষু এবং রক্ত শোষণাগার ছিলো জঙ্গল বাড়ি ঘাটিতে। আর এই তার নতুন প্রচেষ্টা হার্ট শোধনাগার।

হামবার্ট হার্ট অপারেশন এবং হার্ট সংযোগ এ দক্ষতা লাভ করতে চায়। যেমন সে চক্ষু এবং রক্ত শোষণে দক্ষতা লাভ করেছে। এ ব্যাপারে সে কত

খানি সফলতা লাভ করবে সেদিকে তার কোন খেয়াল নেই, তবে সে অবিরত নর-হত্যা করে চলেছে।

হামবার্ট এর মুখে মাক্স এবং হাতে গ্লাক্স করে নিলো।

ততক্ষণ প্রথম দু'জন লোক হাতে পিছ মোড়া করে বাঁধা এবং চোখ বাঁধা একটি লোককে নিয়ে আসে টেবিলটার পাশে।

লোকটার চোখ বাঁধা থাকায় সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তবু সে বুঝতে পারছে তার জন্য কোন ভয়ঙ্কর বিপদ এগিয়ে আসছে ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে তার মুখখানা লোকটার জামা শূন্য, শুধু পরনে একটি পাজামা।

হামবার্টের অনুচর দু'জন লোকটাকে ধরে টেবিলে শুইয়ে দিলো। একজন একটা সিরিঞ্জ এনে ধরলো হামবার্টের সম্মুখে।

হামবার্ট ঐ সিরিঞ্জটা তুলে নিয়ে টেবিলে শায়িত লোকটার হাতে পুশ করে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা অসহ্য যন্ত্রণামূলক আর্তনাদ করে উঠলো তারপর স্থির হয়ে গেলো ওর দেহটা!

হামবার্ট মুহূর্ত বিলম্ব না করে পাশের টেবিল থেকে একটি ছুরি তুলে নিয়ে সংজ্ঞাহীন লোকটার বুক চিড়ে ফেললো তারপর বুকের ভিতর থেকে বের করে আনলো ওর হৃদপিণ্ডটা।

পাশে দাঁড়ানো লোক দুটোর হাতে ছিলো কাঁচপত্র। হামবার্ট হৃদপিণ্ডটা বের করে ঐ কাঁচ পাত্রে রেখে বললো— একে সরিয়ে ফেলো।

লোক দু'টো হামবার্টর আদেশ অনুযায়ী লোকটার রক্তাক্ত দেহটাকে সরিয়ে ফেললো। তারপর তারা অপর আর একজন লোককে পূর্বের মত হাত পিছমোড়া করে বেঁধে টেবিলের পাশে এনে দাঁড় করিয়ে দিলো। এ লোকটিরও চোখ কালো কাঁপড়ে বাঁধা।

মৃতের মত পাংশু বিবর্ণ এর মুখ। হাত পিছ মোড়া করে বাঁধা থাকায় সে একটুও নড়াচড়া করতে পারছে না। তাছাড়া কিইবা করবে সে. মৃত্যু যে আসন্ন তা যেন সে পূর্ব হইতেই বুঝতে পারছে।

লোক দু'জন একেও শুইয়ে দিলো টেবিলে।

হাতের বাঁধন মুক্ত করে দেবার পূর্বে একেও একটা ইনজেকশান পুশ করলো হামবার্ট। লোকটা পূর্বের লোকের মতই আর্তনাদ করে পরক্ষণেই নীরব হয়ে গেলো। স্থির হয়ে এলো ওর দেহটা।

হামবার্ট পূর্বের সেই রক্ত মাখা ছুরিখানা তুলে নিয়ে এর বুকটাও চড়চড় করে চিরে ফেললো তারপর ক্ষিপ্র হাতে বুকের ভিতর থেকে বের করে আনলো হৃদপিণ্ডটা। এই হৃদপিণ্ডটা তুলে নিয়ে রাখলো অপর একটি কাঁচ পাত্রে তারপর পূর্বের হৃদপিণ্ডটা তুলে নিয়ে এই সংজ্ঞাহীন লোকটার বুকে সংযোজনের চেষ্টা চালালো হামবার্ট। তাকে সহায়তা করে চললো তার সঙ্গী দু'জন!

প্রায় ঘন্টা দুই ধরে এসব চললো।

কক্ষ মধ্যে তখন পাওয়ার ফুল বাল্ব জ্বলছে।

নরপিশাচ হামবার্টের ললাটে ঘাম ফুটে উঠেছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তার এ হত্যা যজ্ঞের সাধনা চললো। তারপর বললো তার সঙ্গীদের লক্ষ করে— নিয়ে যাও লাশ দু'টো ফেলে দিয়ে এসো। এক নম্বর হিপিংকার বাইরে অপেক্ষা করছে।

হামবার্ট মুখের মাস্ক এবং হাতের গ্লাস্ক খুলে রেখে যে পথে এসেছিলো সেই পথে বেরিয়ে গেলো।

অদূরে হাত এবং চোখ বাঁধা লোকগুলোর অবস্থা শোচনীয়। আজ তাদের মধ্যে থেকে দু'জন কমে গেলো, কাল আবার কার ভাগ্যে এ হিসাবের অঙ্ক পড়বে কে জানে, চিৎকার করে কাঁদলেও তাদের পরিত্রাণ নেই, তাই কাঁদে না ওরা।

হামবার্ট চলে গেলে তার সঙ্গীদ্বয় মৃতদেহ দু'টো ষ্ট্রেচারে করে নামিয়ে নিয়ে দেয়ালের পাশে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে দেয়াল ফাঁক হলো সেই পথে লোক দু'জন একটি লাশ নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

বাইরে একটি সুড়ঙ্গ পথ ঐ পথে কিছুটা অগ্রসর হয়ে একটি লৌহ দরজা। ঐ দরজা খুলে বেরিয়ে এলো ষ্ট্রেচার হাতে লোক দু'জন।

অদূরে একটি গাড়ি অপেক্ষা করছে।

গাড়িখানা অদ্ভুত ধরণের।

গাড়ির গায়ে লিখা আছে ১নং হিপিংকার।

হামবার্টের লোক দু'জন পর পর লাশ দুটো এনে ঐ ১নং হিপিং গাড়িতে তুলে দেয়।

গাড়িখানা চলে যায় পর্বতের কোন এক সুড়ঙ্গ পথ ধরে গোপন স্থানে।

হামবার্ট তখন তার বিশ্রাম কক্ষে মদের বোতল আর কাঁচ পাত্র নিয়ে মেতে উঠেছে!

নেশায় চুর চুর হয়ে হামবার্ট টলতে টলতে এগিয়ে যায় সে পাশের দরজার দিকে। ও পাশে আর একটি গুহা, তার বিশ্রাম এই গুহাটা। এ সব গুহা মধ্যে কোন বৈদ্যুতিক আলো নেই। মশাল জলছে।

হামবার্ট এই গুহার প্রবেশ করতেই একটি ঘন্টা ধ্বনি হয়।

সঙ্গে সঙ্গে একটি লোক এসে কুর্নিশ জানিয়ে দাঁড়ায়।

হামবার্ট তাকে লক্ষ্য করে কিছু ইংগিৎ করে।

লোকটা চলে যায়।

হামবার্ট টলতে টলতে একটা চেয়ারে বসে পড়ে।

একটু পরেই দু'জন লোক একটি তরুণীকে টানতে টানতে নিয়ে আসে সেই কক্ষে।

তরুণীর পরনে ঘাগড়া। গায়ে পাঞ্জাবী, পাঞ্জাবীর গলায় এবং বুকে জরির কাজ করা রয়েছে। মাথার চুলগুলো দু'পাশে বিনুনী করা। নিশ্চয়ই কোন ইরানী মেয়ে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

হামবার্টের সম্মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দিলো লোক দু'জন ইরানী তরুণীটিকে।

হামবার্ট এর চোখ দুটো তরুণীটিকে লক্ষ্য করে জ্বলে উঠলো, লোভ আর লালাসায় উঠে দাঁড়ালো সে।

পা দু'খানা তার সমান নয় তাই একটু কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলো তরুণীটর দিকে।

তরুণী আর্তনাদ করে উঠলো—না না আমাকে তোমরা নিয়ে চলো.....আমাকে তোমরা নিয়ে চলো....

কিন্তু ততক্ষণে হামবার্ট তরুণীকে ধরে ফেলেছে।

লোক দু'জন তরুণীকে হামবার্টের হাতে তুলে দিয়ে বেরিয়ে গেলো সে গুহা থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে দপ করে নিভে গেলো মশালের আলো।

হামবার্টের লালসা পূর্ণ জড়িত কণ্ঠস্বর—মেরী পিয়ারী মেরী জান....

জমাট অন্ধকার ভেদ করে শোনা গেলো অসহায় নারী কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ।

❑

দিনের পর দিন এমনি কত অসহায়া তরুণীর সর্বনাশ হামবার্ট করে চলেছে তার হিসাব নেই।

প্রতিদিন একটি দুটি তরুণীকে হামবার্টের লোক ফুসলিয়ে নিয়ে আসে। কাউকে শাড়ি গহনার লোভ দেখিয়ে। কাউকে খাদ্যের বিনিময়ে। কাউকে অর্থের মোহে।

হামবার্টের লোকজন শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকে সর্বক্ষণ।

গুহার এক গোপন স্থানে বহু তরুণীকে আটক করে রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে আছে ঝিন্দ বাসিনী, ইহুদী, আরবী, ইরানী, এমন কি বহু বাঙ্গালী তরুণীও আছে।

হামবার্ট এদের ইচ্ছা মত ব্যবহার করে।

যারা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে তাদের পাহাড়ের কোন এক গোপন জায়গায় নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে নর পিশাচ হামবার্টের অনুচরগণ। হত্যা করার পর ছুড়ে ফেলে দেয় কোন অন্ধ গহ্বরে। কেউ কোনদিন এই সব অসহায়া তরুণীদের সন্ধান পায় না।

এতো নারীর সর্বনাশ করেও হামবার্ট খুশি হতে পারেনা সদা সর্বদা আমির আলীর কন্যা নীলার জন্য উন্মাদ। যেমন করে হোক নীলাকে তার চাই।

শুধু নীলার জন্যই আমির আলী সাহেবের জীবনে এসেছে চরম এক বিপর্যয়।

আমির আলী তাদের ব্যবসার প্রথম সহকর্মী। শুধু তাই নয় তিনি নিজেও একজন দক্ষ চক্ষু এবং রক্ত শোষক বৈজ্ঞানিক ছিলেন। একারণেই জঙ্গল বাড়ি ঘাটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিলো। লক্ষ লক্ষ টাকা তিনি পেতেন জঙ্গল বাড়ি ঘাটি থেকে।

যখন আমির আলীর সঙ্গে হামবার্টের গভীর সম্বন্ধ, তখন একদিন শিশু কন্যা নীলাকে হামবার্ট দেখে। ছোট ফুট ফুটে মেয়েটি প্রথম নজরেই তার লালসাপূর্ণ মনটাকে আকৃষ্ট করে তারপর থেকে হামবার্ট নীলার জন্য প্রতিক্ষা করতে থাকে।

কিন্তু সে নীলাকে হাতের মুঠায় পেয়েও যেন পায়না। আমির আলীকে হামবার্ট বহুদিন ধরে নীলা সম্বন্ধে বলে আসছে তবু কোন ফল হয়নি। আমির আলী নীলার বিনিময়ে নীল পাথর চায়,হামবার্ট তাতে রাজি নয়। এবং এ

কারণেই তাদের মধ্যে একটা ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয় শুরু হয় ভীষণ অবস্থা। যার পরিণতি দাঁড়ায় জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস স্তূপ।

শয়তান হামবার্টের জঙ্গল বাড়ি ধবংস স্তূপে পরিণত হলেও তার প্রসার ছিলো কান্দাই পর্বতমালার বহুদূর নিয়ে। জঙ্গল বাড়ির মাটির বাইরে কান্দাই পর্বতমালার তলদেশে গোপন গুহায় তার এই বিশ্রাম কক্ষ। এবং এখানে তার হৃদপিণ্ড অপারেশন থিয়েটার। এ ছাড়াও আরও কতকগুলো গুহা ছিলো যার মধ্যে রয়েছে তার নানা রকম কু'কর্মের সরঞ্জাম।

একটি গোপন গুহায় কতকগুলো অসহায়া তরুণীকে অটকে রাখা হয়েছে। যখন যাকে প্রয়োজন হামবার্ট তার উপর চালায় পাশবিক অত্যাচার। একটি গুহায় তরুণ যুবকদের বন্দী করে রাখা হয়েছে, হামবার্ট ইচ্ছা মত এদের হৃদপিণ্ড নিয়ে অপারেশন পরীক্ষা চালায়।

শয়তান হামবার্ট তার জঙ্গল বাড়ি ঘাটি হারিয়েও দমে যায়নি। যদিও সে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বরং সে আরও বেশি শয়তান হয়ে উঠেছে জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস হওয়ায়! কেমন করে সে আমির আলীকে চরম শাস্তি দেবে। কেমন করে সে নীলাকে নিজস্ব করে নেবে। কেমন করে ধ্বংস করবে আমির আলীর গবেষণাগার।

হামবার্টের আর একটি নতুন চিন্তা দস্যু বনহুর। এবার তার সংগ্রাম দস্যু বনহুরের সঙ্গে।

❑

নীলা এখানে আসার পর তার কোন অসুবিধা হয়নি। সকালে চোখ মেলতেই বেডটি, পরিচ্ছন্ন নাস্তা। দুপুরে পুষ্টিকর খাদ্য সম্ভার। রাতেও সে যা ভালবাসে সেই খাবার। এমন কি নীলা কফি খেতে ভালবাসে, কফি সে না চাইতেই পায়। নীলা অবাক হয়ে ভাবে দস্যু বনহুর কি তার সব কিছু জানে যে সেইভাবে এখানে ব্যবস্থা করে রেখেছে। এখানে তার কোন আদেশ করতে হয়না, যখন যা প্রয়োজন মনে করে তাই সে পেয়ে যায়।

এখানে আসার পর নীলার ভীষণ একটা আতঙ্ক ছিলো দস্যু বনহুর তাকে না জানি কি ভাবে হয়রানি পেরেশানী করবে। কিন্তু ক'টা দিন কেটে গেলো দস্যু বনহুরের সাক্ষাৎ পায়নি সে। দু'জন লোক তার আদেশ পালনে সব সময় হাজির থাকে তারা অতিভদ্র এবং নম্র ভাবে কথা বার্তা বলে।

মাঝে মাঝে নীলা তার আব্বুর সঙ্গে দেখা করে। আব্বুর সঙ্গে অনেক কথা হয়। আমির আলী সাহেব বলেন—মা নীলা বেশ আছি। সংসারের কোন চিন্তা নেই, নেই কোন কাজ, প্রচুর অবসর। জীবনকে এমনভাবে উপভোগ করার সুযোগ আমি পাইনি কোন দিন।

পিতার কথায় নীলা খুশি হতে পারেনা কারণ এমন বন্দী জীবন তার কাছে অসহ্য লাগে। বিশেষ করে রংলালের জন্য মনটা তার সব সময় উদাসীন, একদিন রংলালকে না দেখলে নীলার হৃদয় অন্ধকারে ভরে উঠতো আর আজ ক'দিন সে তাকে দেখতে পায়নি।

নীলা পিতার কথায় বলে—আব্বু আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগছেনা!

কেনো মা তোমার কি কোন অসুবিধা হচ্ছে? বললো আমির আলী সাহেব।

নীলা বললো—না আব্বু কোন অসুবিধা এখানে হয়নি তবে সব সময় আমার মনে ভয় আর দুঃর্ভাবনা....

আমির আলী সাহেব কন্যার কথায় একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—মরার আবার খাঁড়ার আঘাত কি মা। তুই আর আমি মরেই তো গিয়েছিলাম। জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস করে হামবার্ট আমাদের হত্যা করতে চেয়েছিলো কিন্তু দস্যু বনহুরের দয়ায় আমরা জীবনে বেঁচে আছি এটাই তো আমাদের জীবনের পরম ভাগ্য....

আব্বু তুমি বুঝতে পারছোনা উদ্দেশ্য বিহীন কেউ কোন কিছু করেনা। তোমাকে আর আমাকে রক্ষা করার পিছনে নিশ্চয়ই দস্যু বনহুরের কোন স্বার্থ আছে।

তা ঠিক কতখানি সত্য আজও বুঝতে পারছি না। শুনেছি দস্যু বনহুর অতি ভয়ঙ্কর অতি সাংঘাতিক কিন্তু আজও আমি তার মধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে পাইনি মা।

উদ্দেশ্য সফলের সময় এলেই বুঝতে পারবে। আব্বু আমি নিজকে আর সংঘত রাখতে পারছিনা। একটা ভয় আর আতঙ্ক আমাকে অহরহঃ যন্ত্রণা দিচ্ছে। না জানি কখন কোন মুহূর্তে দস্যুটা আমাদের উপর অত্যাচার চালাবে।

মিছে মিছে ভয় পাচ্ছিস নীলা।

না আব্বু মিছে মিছি নয় দেখো দস্যু বনহুর যেদিন তার নগ্ন রূপ উন্মোচন করবে সেদিন তাকে সাধু ভাবতে পারবেনা আর।

পিতা পুত্রি এমনি অনেক কথা হয়।

কোনদিন বলে নীলা—আব্বু চলো এখান থেকে পালিয়ে যাই।

আমির আলী সাহেব বলেন—কোথায় যাবি মা? জানিস যেখানে যাবো সেখানেই হামবার্টের শ্যেন দৃষ্টি আমাদের পিছু নেবে। ঐ শয়তানটার কবল থেকে রক্ষা পাবো বলে আশা ছিলোনা আমাকে হত্যা করে তোকে সে হরণ করবে। নীলা হামবার্টের হাত থেকে তোকে রক্ষা করার উপায় আমার ছিলোনা যদি সেই মুহূর্তে দস্যু বনহুর গিয়ে না পৌঁছতো। মা তুই যাই বলিস আমি কিন্তু দস্যুটাকে সমীহ করি শ্রদ্ধাও করি...

আব্বু...

হাঁ মা।

নীলা এরপর পিতার কক্ষে আর বিলম্ব করেনি, সে অভিমানে ফিরে এসেছিলো নিজের ঘরে। তার আব্বু দস্যু বনহুরকে সমীহ করে এমন কি শ্রদ্ধাও করে। একটা দস্যুর প্রতি এতোখানি অনুরাগ নীলার পছন্দ হয়না।

নিজের কক্ষে ফিরে এসে নীলা গম্ভীর মুখে বসে থাকে।

দস্যু বনহুরের একজন অনুচর এসে বলে—আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে।

টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখে যাও। নীলা কথাটা বলে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

একটু পরে আর একজন এসে বলে—খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো খাবেন কখন?

নীলা বললো—যখন আমার ইচ্ছা খাবো। তোমরা যাও।

চলে যায় লোকটা।

ঘন্টা কয়েক কেটে যায়।

রাত বাড়তে থাকে।

আবার একজন আসে—এখনও খাননি? উঠুন—খেয়ে নিন।

খাবো না যাও।

কেনো খাবেন না?

বিরক্ত করো না যাও বলছি।

আপনি না খেলে সর্দার আমাদের উপর রাগ করবেন।

আমি না খেলে তোমাদের সর্দারের কি এসে যাবে। আমি যাবোনা। তোমরা আর বিরক্ত করতে এসোনা।

আচ্ছা যাচ্ছি।

অনুচরদ্বয় বেরিয়ে যায়।

নীলা দরজা বন্ধ করে দেয় যাতে ওরা আর আসতে না পারে। দরজা বন্ধ করে ফিরে তাকাতেই চমকে উঠে নীলা, কক্ষের মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে দস্যু বনহুর।

জমকালো পোশাক পরা। পাগড়ির আঁচল দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢাকা। পায়ে হাটু অবধি ভারী বুট। কক্ষের বৈদ্যুতিক উজ্জল আলোতে দস্যু বনহুরের বুট দুটো চক চক করছে।

নীলার মুখমণ্ডল ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠলো। সে দরজা বন্ধ করে দিলো কিন্তু দস্যু বনহুর এলো কি করে? নীলা আড়ষ্ট হয়ে যায় একেবারে।

বনহুর দু'পা এগিয়ে আসে।

নীলা ভীতভাবে পিছু হটে যায়।

বনহুর বলে—মিস নীলা বলেছিলাম আবার আসবো তাই এসেছি। শুনলাম কাল থেকে আপনি অনাহারে রয়েছেন! কিন্তু কেনো?

নীলা বলে উঠে—আমি না খেলে তোমার কি এসে যায়? আমি খাবোনা?

কেনো সে কথা আমাকে বলতে হবে?

আমি তোমাকে কোন কথা বলতে রাজি নই।

একটু হাসে বনহুর—জানো তুমি এখন কোথায়?

জানি দস্যু বনহুরের বন্দীশালায়।

এবার অট্টহাসিতে ভেংগে পড়ে বনহুর তারপর হাসি থামিয়ে বলে—আমার বন্দীশালায় মিস নীলার বুঝি খুব অসুবিধা হচ্ছে।

নীলা কোন জবাব দেয়না।

বনহুর বলে—জানি অসুবিধা কি—এবং কোথায়। তবু বাধ্য হয়ে আমি আপনাদের এখানে এনেছি। হামবার্ট শুধু আপনার পিতাকেই হত্যা করতোনা। সে আপনাকে আত্মসাৎ করতো। মিস নীলা আপনি কোনটা চান হামবার্টের কাছে আত্মসম্পর্ণ না দস্যু বনহুরের বন্দীশালায় আত্মগোপন?

নীলা চোখ তুলে তাকালো দস্যু বনহুরের চোখ দু'টোর দিকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে বনহুর।

নীলার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো। কোন কথা বললোনা।

বনহুর আবার বলে উঠে—আপনি নীরব রইলেন, এতে আমি বুঝবো আপনি আমার বন্দীশালা থেকে মুক্তি চান।

হাঁ আমি মুক্তি চাই। আমার বাড়িতে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো।

বাড়িতে যাবার সখ দেখছি অত্যন্ত কিন্তু মনে রাখবেন যার জন্য আপনি সে বাড়িতে যেতে চাই. ন সেই রংলাল নেই।

বিস্ময় ভরা অস্ফুট কণ্ঠে বলে নীলা—রংলাল নেই?

না।

সে কোথায় গেছে বলতে পারো?

হাঁ।

বলো—বলো কোথায় গেছে রংলাল? কেনো গেছে সে?

তাকে হামবার্টের লোক ধরে নিয়ে গেছে।

আর্তকণ্ঠে বলে উঠে নীলা—রংলালকে হামবার্টের লোক ধরে নিয়ে গেছে।

হাঁ মিস নীলা।

কেন কি জন্য তাকে সে ধরে নিয়ে গেলো? বলবে আমাকে?

নিশ্চয়ই বলবো!

বলো? বলো? নীলা আগ্রহ ভরা কণ্ঠে বলে উঠে।

বনহুর বলে এবার—হামবার্ট জানে আপনি ঐ যুবকটাকে ভালবাসেন। সে থাকতে আপনাকে হামবার্ট পাবেনা এটাও সে জানে ভালভাবে। কাজেই রংলালকে সরানো ছাড়া তার কোন উপায় ছিলোনা। শুধু তাই নয় রংলালকে সে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলবে....

না না এ হতে দেবোনা! দস্যু বনহুর তুমি পারবেনা আমার রংলালকে হামবার্টের কবল থেকে উদ্ধার করতে? তুমি যা চাইবে আমি তোমাকে তাই দেবো।

বনহুর এবার মেঝেতে পায়চারী করে চলে।

নীলা আরও সরে আসে বনহুরের পাশে। করুণকণ্ঠে বলে—বলো তুমি কি চাও?

যদি বলি আমি তোমাকে চাই।

মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠে নীলার মুখমণ্ডল। অধর দংশন করে বলে সে—জানি তুমি কি উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এখানে এনেছো? কিন্তু মনে রেখো তোমার আশা পূর্ণ হবেনা।

বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকায় নীলার দিকে—হুঁ বেশ কথা বলছেন দেখছি! দস্যু বনহুরের বন্দীশালায় বন্দিনী থেকে এমন ধরণের কথা বলতে পারলেন। জানেন এখানে আপনাকে রক্ষা করে এমন একটি প্রাণী নেই।

নীলার মুখভাব করুণ হয়ে উঠে, ভয় কম্পিত কণ্ঠে বলে—দস্যু বনহুর তুমি আমাকে হামবার্টের কবল থেকে রক্ষা করেছো। এমন কি মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছো, আমি তোমার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো।

কৃতজ্ঞতা দস্যু বনহুর চায়না। মিস নীলা, আমি পূর্ব হতেই বলেছি রংলালকে আপনার ভুলতে হবে। হামবার্ট ওকে হত্যা করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কেঁদে উঠে নীলা—আমি ওকে ছাড়া বাঁচবোনা। দস্যু বনহুর তুমি আমাকে হামবার্টের ওখানে নিয়ে চলো....

ইজ্জতের বিনিময়ে আপনি রংলালকে ফিরিয়ে নিতে চান মিস নীলা?

বলো আমি কি করবো এখন? দস্যু বনহুর তুমি আমাকে বলে দাও?

আমি বলেছি রংলালের মোহ আপনি ত্যাগ করুন।

নীলা বনহুরের পা দু'খানা চেপে ধরে বলে উঠে—আমি পারবোনা আমাকে মাফ করো....ওকথা আর তুমি বলোনা.....আমি সহ্য করতে পারি না দস্যু বনহুর....

হামবার্ট যদি তাকে হত্যা করে ফেলে?

আমি বাঁচাবোনা। দস্যু বনহুর তুমি আমাকে হত্যা করে ফেলো তবু আমি ওকে ভুলতে পারবোনা....

তা হলে আপনি হামবার্টের হাতে নিজকে সমর্পণ করে, তবু রংলালকে ফিরিয়ে আনতে চান?

নীলা কোন কথা বলেনা, নীরবে সে বনহুরের পায়ের কাছ হতে উঠে দাঁড়ায়।

বনহুর বলে—এখন আমি যাচ্ছি, আপনি নিজের ইজ্জত রক্ষা করতে চান, না রংলালকে ফিরিয়ে চান, মনস্থির করে বলবেন। কিন্তু আপনি খেয়ে নেবেন।

বনহুর পিছন দেয়ালের পাশে গিয়ে একটা চাকতীর মত জিনিসে চাপ দেয়, সঙ্গে সঙ্গে দেয়াল খানার মধ্যে একটি ছোট দরজা বেরিয়ে আসে। বনহুর সেই পথে বেরিয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

নীলা চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে।

টেবিলে খাবার তেমনি পড়ে থাকে।

সমস্ত রাত নীলা অশ্রু বিসর্জন করে কাটায়।

ভোরে ঘুমিয়ে পড়ে এক সময় সে।

নীলা আর আমির আলী সাহেব যখন বনহুরের কান্দাই শহরের আস্তানার গোপন কক্ষে নিদ্রায় মগ্ন তখন হামবার্টের তিনজন সহকর্মী আমির আলী নীলার সন্ধানে কান্দাই শহরে তাদের বাস ভবনে এসে হাজির।

তিনজন সহকর্মীদের মধ্যে মাদার্ন নিজেও আছে।

রবার কোম্পানীর এজেন্ট এর বেশেই এরা আজ এসেছিলো আমির আলী সাহেবের বাস ভবনে।

কিন্তু একি মাদার্নের মাথায় যেন আকাশ ভেংগে পড়লো। আমির আলী এবং নীলা কেউ নেই বাসভবনে। দারওয়ান তিন জনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো মাদার্ন—তোমাদের সাহেব এবং মেম সাহেব কোথায় গেছে বলতে পারো? আমরা রবার কোম্পানী থেকে এসেছি তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবো আমাদের কোম্পানী দেখার জন্য। অবশ্য আমির আলী সাহেবকে পূর্বেই একথা বলে গিয়েছিলাম।

মাদার্নের কথার জবাবে বলে পুরোন দারওয়ান শেঠজী—হুজুর সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। আমরা রাতে পাহারা দিচ্ছি যেমন রোজ রোজ দেই। গভীর রাতে হঠাৎ আমার পিছনে কেউ যেন এসে দাঁড়ালো। আমি যেমন ফিরে তাকিয়েছি অমনি দেখলাম একটা জমকালো পোশাক পরা লোক, লোকটা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ধরে ফেললো। সেকি অসীম শক্তি তার শরীরে আমি একটুও নড়তে পারলামনা, জমকালো পোশাক পরা লোকটা আমার মুখে রুমাল গুঁজে দিয়ে হাত দু'খানা পিছুমোড়া করে বেঁধে ফেললো তারপর আমাকে কাঁধে উঠিয়ে গ্যারেজের মধ্যে নিয়ে গেলো! সেখানে এনে আমাকে ফেলে দিলো ধপ করে। আমি, আমি কোন নরম জিনিসের উপর এসে পড়লাম। পরদিন ভোরে দেখি আমার দেহের নিচে বাড়ির আরও দু'জন দারওয়ান হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে।

মাদার্নের চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠে। শুধু বিস্ময় নয় একটা দারুন ভয়। বলে সে—তাদের কি তবে কেউ ধরে নিয়ে গেছে?

ঠিক বলতে পারছিনা হুজুর কারণ আমরা সকালে শুনতে পাই মালিক এবং তার কন্যা নীলা আপামনিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা।

এ সংবাদ নিয়ে মাদার্নও তার সঙ্গীদ্বয় ফিরে যায় কান্দাই পর্বত মালার সেই গোপন ঘাটিতে?

হামবার্ট বিপুল উন্মাদনা আর লালসা নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলো। সে জানতো মাদার্ন কোন মতেই রিক্ত হাতে ঘুরে আসবেনা।

মাদার্ন ও তার সঙ্গীদ্বয় যেমন শুন্য হাতে ফ্যাকাশে মুখে নর শয়তান হামবার্টের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, অমনি ভয়ঙ্করভাবে গর্জে উঠে হামবার্ট— শিকার কই?

মাদার্ন হাতের মধ্যে হাত কচকে বলতে গেলো—তারা নেই....

মাদার্নের মুখের কথা শেষ হলোনা হামবার্টের হাতের ছোরাখানা বিদ্ধ হলো তার বুকে।

তীব্র একটা আর্তনাদ করে উঠলো মাদার্ন দু'হাতে সে বুকটা চেপে ধরলো শক্ত করে।

হামবার্ট ছোরাখানা একটানে তুলে নিলো।

সঙ্গে সঙ্গে টলতে লাগলো মাদার্নের দেহটা, তারপর চীৎ হয়ে পড়ে গেলো পাথুরে মেঝেতে।

হামবার্ট এবার মাদার্নের সঙ্গীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললো—তারা নেই তবে গেলো কোথায়?

ভয়ে এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ী করে নিলো।

একজন বললো—জমকালো পোশাক পরা একটা লোক আমির আলী ও তার কন্যা নীলাকে ধরে নিয়ে গেছে!

হামবার্ট চিৎকার করে উঠে—কি বললে আলী আর নীলাকে একটি জমকালো পোশাক পরা লোক ধরে নিয়ে গেছে?

হাঁ মালিক।

হামবার্ট মাটিতে পদাগাত করে বলে উঠে—দস্যু বনহুর। দস্যু বনহুর আলী আর নীলাকে ধরে নিয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারছি নীলাকে তার প্রয়োজন। নরাধম জানেনা হামবার্টের মুখের শিকার কেড়ে নিয়ে সে বাঁচতে পারবেনা....আমি তাকে দেখে নেবো কত বড় দুঃসাহসী দস্যু সে।

এমন সময় গোংলাইসিং একটা পুটলী হাতে ভিতরে প্রবেশ করে সেলুট দিয়ে দাঁড়ায়—মালিক!

হঠাৎ তার নজর পড়ে মাদার্নের রক্তাক্ত দেহটার দিকে। আরষ্ট হয়ে যায় সে মুহূর্তের জন্য।

হামবার্ট ধমক দিয়ে বলে—কি সংবাদ গোংলাইসিং?

মালিক এনেছি।

কি এনেছো?

রংলাল কে....

রংলাল! কোথায় রংলাল?

সর্দার তাকে জীবন্ত আনতে পারিনি তার মাথাটা.....

জীবন্ত আনতে পারোনি তার মাথা কেটে নিয়ে এসেছো?

হাঁ—হাঁ মালিক তাই এনেছি। আপনি তো বলেছিলেন মাদার্ন আনবে আলী আর নীলাকে আর তুমি আনবে—রংলালকে, তাই এনেছি.....এই দেখুন রংলালের মাথাটা আমি কেটে এনেছি।

গোংলাইসিং পুটলীটা খুলে মেলে ধরে।

সঙ্গে সঙ্গে হামবার্ট বলে—বেশ করেছো গোংলাইসিং তুমি ভাল কাজ করেছো। এই নরপশুটা নীলার মন জয় করে নিয়েছিলো।

হামবার্ট খণ্ডিত মস্তকটায় পদাঘাত করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

খণ্ডিত মস্তকটা গড়িয়ে পড়লো হামবার্টের পায়ের এক পাশে। এখনও গলাটায় চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে। চোখ দুটো মুদিত, চুলগুলো এলো মেলো।

❑

আমির আলী সাহেবের বাড়িতে মহা হই-চই পড়ে গেলো আমির আলী এবং নীলা হঠাৎ উধাও হওয়ার খবর পেয়ে আমির আলী সাহেরব ভ্রাতুষ্পুত্র হাসিম কায়েসী এসেছিলো ফাংহা থেকে। এতো বড় বাড়ি প্রচুর ধনসম্পদ এখন তাকেই দেখাশোনা করতে হবে। কিন্তু সেই রাতে সে নিহত হয়েছে। কে বা কারা তার দেহ থেকে মাথাটা কেটে নিয়ে গেছে।

শিক্ষিত সুশ্রী বলিষ্ঠ যুবক হাসিম কায়েসীর অনেক আশা চাচা আমির আলীর অনুপস্থিত কালে তার বিপুল ঐশ্বর্য যেন বিনষ্ট না হয় তাই সে সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছিলো সুদূর ফাংহা থেকে।

হাসিম কায়েসী সবেমাত্র বিদেশ থেকে উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে কান্দাই ফিরে এসেছিলো। বৃদ্ধ পিতা জায়েদ কায়েসী ফাংহায় থাকেন। হাসিম কায়েসী বিদেশ থেকে ফিরে পিতার কাছে গিয়েছিলো বেড়াতে। সেখানেই সে তার

কর্ম জীবন শুরু করবে ভাবছিলো এমন সময় আমির আলীর ম্যানেজার মনি খার টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে আসে কান্দাই।

কান্দাই এসে হাসিম কায়েসী সব শুনে গভীর দুঃখে ভেংগে পড়ে। কারণ তার চাচা আমির আলী সাহেব তাকে নিজ পুত্রের মতই স্নেহ করতেন চাচারও বড় আশা তার অবর্তমানে হাসিম তার বিশাল ঐশ্বর্যের অধিপতি হবে। নীলাকেও সঁপে দেবেন তিনি হাসিমের হাতে।

চাচা আমির আলী এবং নীলার হঠাৎ উধাও ব্যাপার নিয়ে হাসিম এসেই নানাভাবে খোঁজ খবর শুরু করেছিলো। পুলিশ মহলকেও সে এ ব্যাপার নিয়ে দারওয়ানদের কাছে শোনা কথার উপয় ভিত্তি করে সব জানিয়েছিলো এবং যাতে তাঁদের খুঁজে বের করা হয় এ জন্য ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলো।

সমস্ত দিন গাড়ি নিয়ে নিজেই ছুটোছুটি করেছিলো বেচারী। সন্ধ্যার পর সে পুলিশ অফিস থেকে ফিরে অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে তাই সকাল সকাল চারটি খেয়ে শুয়ে পড়েছিলো হাসিম।

কিন্তু আর সে ভোরের সূর্য দেখতে পেলোনা।

চাকর বাকর সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো এতক্ষণও হাসিম উঠছেনা দেখে। টেবিলে নাস্তা দেওয়া হয়ে গেছে! চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে তবু ঘুম ভাংছেনা তার।

ম্যানেজার মনি খাঁ বার বার দরজার পাশে এসে ঘোরাঘুরি করছে কারণ সকালে ব্রেক ফাষ্ট করার পর তাদের পুলিশ অফিসে যাওয়ার কথা আছে কিন্তু বেলা অনেক হয়ে এলো এখনও জাগছেনা হাসিম কায়েসী।

মনি খাঁ ভাবছেন এসে অবধি অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছেন তাই ঘুম ভাংতে হাসিম কায়েসীর এতো বিলম্ব হচ্ছে।

কিন্তু আরও বেলা যখন বেড়ে গেলো তখন মনি খাঁ চিন্তিত হয়ে পড়লো।

হঠাৎ এমন সময় তার কানে আসে মালির চিৎকার—রক্ত....রক্ত ...রক্ত.....

এক দণ্ডে লোকজন ছুটে যায় বাগানের মধ্যে।

মালি আংগুল দিয়ে বাগানের মধ্যে হাসিম কায়েসীর কক্ষের পিছন জানালটা দেখিয়ে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে ঐ জানালায়। ভয়ে আতঙ্কে সবাই চমকে উঠে। দেখতে পায় জানালায় জমাট রক্তের ছাপ। রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে উঠেছে।

ম্যানেজার মনি খাঁ ছুটলেন কক্ষের সম্মুখের দিকে।

দরজা ভেংগে খোলার আদেশ দিলো সে।

অল্পক্ষণেই দরজা ভেংগে ফেলা হলো।

এক সঙ্গে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করলো অনেকে। মনি খাঁ সবার আগে।

বিছানার পাশে এসে চিৎকার করে উঠলো মনি খাঁ—খুন, হাসিম সাহেব খুন হয়েছেন...

সবাই তাকিয়ে দেখলো বিছানায় মস্তক হীন হাসিম কায়েসীর দেহটা পড়ে আছে। রক্তে লালে লাল হয়ে গেছে বিছানা আর বালিশটা।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসে ফোন করলো মনিখাঁ।

অল্পসময়ের মধ্যে পুলিশ সুপার এবং পুলিশ ইন্সপেক্টার কতকগুলো পুলিশ সহ আলি সাহেবের বাসভবনে এসে পড়লেন।

আমির আলী সাহেব এবং নীলা উধাও ব্যাপার নিয়ে এই হত্যা রহস্য সম্বন্ধে সব কথা শোনার পর পুলিশ সুপার ও পুলিশ ইন্সপেক্টার বুঝতে পারলেন এটা দস্যু বনহুরের কাজ। কারণ দারওয়ানগণ যে বর্ণনা দিলো তাতে স্বয়ং দস্যু বনহুর ছাড়া এ কাজ অন্য কেউ করেনি বলেই প্রমাণিত হলো।

পরদিন এই সংবাদ কান্দাই পত্রিকায় বিরাট কলেবরে প্রকাশিত হলো।

কান্দাইবাসীগণের মনে আবার সৃষ্টি হলো নতুন এক আতঙ্ক। শহরের সর্বত্র ত্রাসের সৃষ্টি হলো, বন্ধ কক্ষে মস্তকহীন দেহ কম কথা নয়।

এ সংবাদ এক সময় চৌধুরী বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলো।

নূর পত্রিকা হাতে মায়ের কাছে এসে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—আম্মি আম্মি দেখো আবার দস্যু বনহুর হত্যা লীলা শুরু করেছে।

মনিরা পুত্রের কথায় কোন জবাব না দিয়ে ওর হাত থেকে পত্রিকা খানা নিয়ে মেলে ধরে চোখের সামনে।

"কান্দাই শহরে আবার ত্রাসের সঞ্চার'

দস্যু বনহুরের নৃশংস হত্যা লীলা!

কয়েকদিন পূর্বে দস্যু বনহুর শহরের ধনবান ব্যক্তি

খান বাহাদুর আমির আলী কায়েসী ও তার কন্যা

মিস লীলাকে তাদের বাস ভবন থেকে উধাও করেছে।
দস্যু বনহুর শুধু তাদের হরণ করেই ক্ষান্ত হয়নি
সে খান বাহাদুর আমির আলীর ভ্রাতুস্পুত্র মিঃ
হাসিম কায়েসীকে অদ্য রাত্রিতে তার শয়ন কক্ষে হত্যা
করে তার দেহে থেকে মাথাটা দ্বিখণ্ডিত করে নিয়ে
গেছে। কক্ষ মধ্যে মস্তকহীন অবস্থায় মিঃ হাসিম
কায়েসীকে পাওয়া গেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে
জোর তদন্ত শুরু করেছে এবং শহরবাসীকে সজাগ
থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।
কান্দাই সরকার দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য দুই লক্ষ
টাকা পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন এবার তার পরিমাণ
তিন লক্ষ টাকা করা হয়েছে।"

একবার নয় দু'বার তিন বার পড়লো মনিরা সংবাদ পত্রের লেখাগুলো। গভীর একটা চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো তার চোখে মুখে।

নূর বলে উঠলো আম্মি তুমি বিশ্বাস করতেই চাওনা, দেখলে তো দস্যু বনহুর কোনদিন সৎ ও মহৎ হতে পারেনা।

মনিরার মনে পড়ে কয়েকদিন আগে নূর তার পাশে শুয়ে শুয়ে কি যেন গল্প করছিলো কথায় কথায় দস্যু বনহুরের কথা তোলে নূর। মনিরা বলেছিলো, নূর তুই জানিস না বাপ দস্যু বনহুর মোটেই অসৎ নয়।

নূর আরও অনেকদিন দস্যু বনহুর সম্বন্ধে মায়ের মুখে এই ধরনের উক্তি শুনেছিলো তাই আজ সে বলে বসে শুধু তাই নয় আম্মি দস্যু বনহুর হীন জঘন্য...

মনিরার সহ্যের বাঁধ ভেংগে যায়, চিৎকার করে বলে—নূর! চুপ কর...

আম্মি দস্যু বনহুর সম্বন্ধে সংবাদ পত্রে তার জঘন্য ঘৃন্য আচরণ সম্বন্ধে জেনেও তুমি তা অস্বীকার করতে চাও। এই দস্যুটার জন্য কান্দাই-এর লোকের মনে কোন শান্তি নেই স্বস্তি নেই।

মনিরা এবার শান্ত কণ্ঠ বলে এ সব কথা ভুলও হতে পারে!

তুমি কিছু বুঝনা আম্মি সংবাদ পত্রে এমন ভুল কোন দিন হতে পারে না। যাই বলো বড় হয়ে এই দস্যুকে আমি সায়েস্তা করবো। তুমি দেখে নিও।.....

নূর...

মনিরা!

চমকে ফিরে তাকায় মনিরা—তুমি!

সঙ্গে সঙ্গে নূর আনন্দ ধ্বনি করে উঠে—আব্বু।

বনহুর নূরকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে ওর গালে ছোট্ট একটু চুমু দিয়ে বলে—মা ছেলে মিলে খুব ঝগড়া হচ্ছিলো বুঝি।

নূর বলে দেখোনা আব্বু আম্মি কিছুতেই দস্যু বনহুরকে অসৎ বলতে দেবেন না। আব্বু জানো আজ রাতে সে একটা বাড়িতে ঢুকে একটি নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে আর তার মাথাটা কেটে নিয়ে গেছে।

হ্যাঁ আববু আমি সংবাদ পত্রে দেখেছি।

বলোতো কত বড় হৃদয়হীন এই দস্যুটা।

মনিরা বলে উঠে—নূর এখন পড়বে যাও।

নূর বলে এখন বুঝি পড়ার সময়।

বনহুর একটু হেসে বলে তাইতো এখন কি পড়াশোনা করার সময়। তুমি খেলতে যাও আব্বু কেমন?

আব্বু আজ কিন্তু তোমাকে যেতে দেবোনা।

কেনো?

আমাদের ফুটবল খেলা আছে তুমিও যাবে আমাদের খেলা দেখতে।

আচ্ছা যাবো।

নূর চলে যায়।

মনিরা মুখ গম্ভীর করে নিজের ঘরে প্রবেশ করে।

বনহুর মনিরাকে অনুসরণ করে তার পিছনে পিছনে এগিয়ে যায়—মনিরা।....

আর কতদিন এসব শুনতে হবে বলো? লোকের মুখে শুনে শুনে ঝাঁজরা হয়ে গেছি এখন পেটের ছেলের মুখে....

মনিরা তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছো

তুমি ছাড়া এমন জঘন্যতম কাজ কে করবে বলো? শুধু হত্যাই নয় নারী হরণ শুরু করেছো আজ কাল...

মনিরা।

তুমি গোপন রাখতে চাইলেও গোপন নেই কোন কথা। ছিঃ ছিঃ লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়। এর চেয়ে তুমি আমাকে হত্যা করে সব জালা

মিটিয়ে দাও। তোমার মত স্বামী পেয়ে একদিন আমি গর্বে আত্মহারা হয়ে ছিলাম আর আজ দেখি...

বলো আরও বলো মনিরা থামলে কেনো? যত ইচ্ছা বলো শুধু তুমি কেনো সবাই আমাকে অহরহঃ জঘন্য বলে গালাগাল করে। আমি জানি এসব তারা মিথ্যা বলেনা যেমন তুমি বলছো। কিন্তু আমি কি সত্যই তোমাদের এই ঘৃণার পাত্র? মনিরা আমি নিজেই নিজেকে অভিশাপ দেই।...

মনিরা বনহুরের মুখে হাত চাপা দেয়, চুপ করো। চুপ করো!

আমাকে বলতে দাও মনিরা, কান্দাই শহরে যত মন্দ কার্জ সংগঠিত হয় সবই করি আমি। যত নর হত্যা, যত নারী হরণ সবই দস্যু বনহুরের কাজ মনিরা সবাই বলে আমি তা গ্রাহ্য করিনা কিন্তু তুমি যখন আমাকে অবিশ্বাস করো তখন আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলি, আমি জানি সবাই আমাকে হীন জঘন্য বললেও কিছু এসে যাবে না শুধু তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস করো মনিরা।

তুমি কি বলতে চাও খান বাহাদুর আমির আলী ও তার কন্যা নীলাকে হরণ করোনি?

করেছি কিন্তু পাপ মনোবৃত্তি নিয়ে নয় প্রয়োজনে। অবসর সময়ে সব বলবো তোমাকে।

তুমি খান বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করে তার মাথা নিয়ে গেছে কেনো?

এমন হৃদয়হীন আমি নই মনিরা। তুমি তো জানো তোমার স্বামী কোন দিন নিরীহ মানুষকে হত্যা করেনা।

গতরাতের হত্যালীলা তুমি করোনি?

না।

তবে কে করেছে?

জানি না।

মিথ্যা কথা।

বিশ্বাস করো আমি হত্যালীলা সম্পর্কে কিছু জানি না।

মনিরা অবাক চোখে তাকায় স্বামীর মুখের দিকে।

বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় কাছে মনিরা। অনেক সময় নিজের উপর বড় ধিক্কার আসে, ভাবি আত্মহত্যা করে নিজের অভিশপ্ত জীবন শেষ করে দেবো

কিন্তু পারি না—শত শত অসহায় করুণ মুখ ভেসে উঠে চোখের সামনে। হাজার হাজার দুঃখী মানুষের করুণ কান্নার সুরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই কানের কাছে। লক্ষ লক্ষ মা বোনের চোখের পানি আমার মনকে অস্থির করে তোলে। মনিরা আমি পারিনা মরতে.....

মনিরা স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে বলে—তোমাকে মরতে দিলে তো তুমি মরবে। কান্দাই এর কোটি কোটি মানুষ তোমাকে ধরে রাখবে। তুমি যে সবার নয়নের মনি...একটু থেমে বলে মনিরা— চলো হাত মুখ ধোবে চলো। আমি তোমার খাবার নিয়ে আসি।

না মনিরা বেশিক্ষণ আমি থাকতে পারবো না। যতক্ষণ থাকি ছাড়বোনা তোমাকে।

তবে নূরকে কথা দিলে কেনো?

নূরের সঙ্গে মাঠে খেলা দেখতে যাবো আর ফিরে আসবো না—কারণ বহু কাজ আছে মনিরা।

তা হবে না—শুধু তোমার কাজ আর কাজ।

মা কোথায়?

মা বাসায় নেই ফিরোজাদের বাসায় গেছে।

ফিরোজা?

তুমি চিনবে না, মামীমার বোনের মেয়ে। অনেক দিন যাননি কিনা তাই গেছেন ওদের বাড়ি।

ও!

লক্ষ্মীটি তুমি বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসো, আমি চট করে তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসি!

আচ্ছা যাও বেশি কিন্তু দেরী করো না।

করবো না, করবো না এক্ষুণি আসবো।

মনিরা চলে যায়।

রান্না ঘরে বাবুর্চী তখন পাকশাক নিয়ে ব্যস্ত আছে। মনিরা স্বামীর জন্য নিজের হাতে কিছুটা খাবার তৈরি করে নিয়ে বেরিয়ে আসে।

সিড়ির মুখে আসতেই চমকে উঠে মনিরা তিনজন সশস্ত্র পুলিশ অফিসার ভিতরে প্রবেশ করছে তাদের সঙ্গে রয়েছে বৃদ্ধ সরকার সাহেব।

মনিরার কানে গেলো সরকার সাহেবের গলা—সত্যি বলছি আমি জানি না....

পুলিশ ইন্সপেক্টরের গলা—আমাদের গোয়েন্দা পুলিশ নিজেরা চোখে দেখেছেন একটি ভদ্রলোক আপনাদের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেছেন আমরা সন্দেহ করছি তিনি স্বয়ং দস্যু বনহুর—

মনিরা আর মুহূর্ত দাঁড়ায় না সে খাবারের ট্রে হাতে চলে যায় নিজের ঘরে যেখানে সে একটু পূর্বে তার প্রিয়তমকে রেখে গেছে।

কিন্তু ঘরে প্রবেশ করে অবাক হয় শূন্য ঘরখানা খাঁ খাঁ করছে। মনিরা খাবারের ট্রে টেবিলে নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বাথ রুমে ধাক্কা দেয়। দরজা খোলা ভিতরে কেউ নেই।

হঠাৎ মনিরার নজরে পড়ে বালিশের উপরে ছোট্ট এক টুকরা কাগজ। মনিরা দ্রুত হাতে কাগজের টুকরাখানা তুলে নেয় হাতে ওতে লেখা আছে—

"প্রিয়া, কিছু বলবো বলে এসেছিলাম কিন্তু
হলো না। তোমার হাতের খাবারও খাওয়া
ভাগ্যে নেই। চলে যাচ্ছি...
তোমার মনির

মনিরার চোখ দিয়ে গড়িয়ে গড়ে দু'ফোটা অশ্রু। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার বাইরে পুলিশ অফিসারদের গলা শোনা যায়।

মনিরা চট করে আঁচল দিয়ে চোখের পানি মুছে নেয়।

কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে বৃদ্ধ সরকার সাহেব—মা মনি পুলিশ অফিসারগণ এসেছেন এ ঘরে আসবেন।

মনিরা বললো—আসতে বলুন।

সরকার সাহেব তিনজন পুলিশ অফিসারসহ ভিতরে প্রবেশ করে।

মনিরা চিঠির টুকরাখানা ব্লাউজের ফাঁকে রেখে এক পাশে সরে দাঁড়ায়।

পুলিশ অফিসারত্রয় সমস্ত ঘরখানা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকেন।

বাড়ির বাইরে অসংখ্য পুলিশ ফোর্স ঘিরে আছে। পুলিশ অফিসারত্রয় সমস্ত বাড়িখানায় তল্লাসী চালিয়ে কোথাও বনহুরকে খুঁজে পায় না।

এদিকে পুলিশ অফিসারগণ যখন অন্তপুরে দস্যু বনহুরের সন্ধান করে চলেছে তখন বনহুর পিছন পাইপ বেয়ে বাগানে প্রবেশ করে একটা হানু হানার ঝোপের পাশে আত্মগোপন করে সব লক্ষ্য করে সে।

অদূরে পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির মধ্যে ড্রাইভার বসে বসে ঝিমুচ্ছে। হয়তো বেচারী সমস্ত রাত ঘুমায়নি।"

বনহুর ভালভাবে তাকিয়ে দেখলো গাড়িখানার আশে পাশে কেউ নেই। গাড়ি বারেন্দায় তার গাড়িখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে। অদূরে গ্যারেজ সেদিকেও কেউ নেই।

বনহুর অতি সন্তর্পণে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে গাড়িখানার পাশে এসে দাঁড়ায় তারপর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ড্রাইভারের মুখে রুমাল গুঁজে দিয়ে টেনে নামিয়ে নেয়। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নেয়—না এদিকে কেউ নেই। কারণ এটা বাইরের দিক, বাড়িটাকে শুধু পুলিশ ঘেরাও করে রেখেছে বাইরের দিকে নয়।

বনহুর ড্রাইভারকে তুলে নিয়ে গ্যারেজে প্রবেশ করে। দ্রুত হস্তে খুলে নেয় ওর পোশাক পরিচ্ছদ। পরে নেয় সে তারপর মাথার ক্যাপ তুলে দেয়। ফিরে আসে গাড়ির পাশে।

ততক্ষণে পুলিশ অফিসারত্রয় গাড়িখানার দিকে এগিয়ে আসেন।

বাড়ির পিছন দিকে যে সব পুলিশ পাহারা দিচ্ছিলো তারাও তাদের নিজ নিজ পুলিশ ভ্যানে চেপে বসে।

বনহুর গাড়ি ছাড়লো।

পুলিশ সুপার বললেন—মিঃ জাফরীর অফিসে চলো।

ড্রাইভ আসনে বনহুর মাথা কাৎ করে বললো—আচ্ছা স্যার।

গাড়িতে বসে পুলিশ অফিসার উদ্বিগ্নতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে চললো।

পুলিশ সুপার আরিফ হোসেন বললেন—এমনভাবে হয়রানি হবো ভাবতে পারিনি। মিঃ জাহেদ আপনি হয়তো ভুল দেখেছেন?

স্যার আমি মোটেই ভুল দেখিনি। দেখেছি একটি যুবক গাড়ি থেকে নেমে চৌধুরী বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলো। নিশ্চয়ই সে দস্যু বনহুর কারণ যুবকটির চেহারা অত্যাধিক সুন্দর এবং বলিষ্ঠ।

হাসলেন পুলিশ সুপার—আপনার সন্দেহ সত্য নয় মিঃ জাহেদ। সমস্ত বাড়িখানা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো তবু সেই যুবকটিকে পাওয়া গেলোনা তবে গেলো কোথায়?

স্যার আমিও তাই ভাবছি সে গেলো কোথায়?

অপর অফিসার এতোক্ষণ নীরব ছিলেন তিনি বললেন—দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা যত সহজ মনে করেন কিন্তু তত সহজ নয়! মিঃ জাফরীর মত মানুষ হীমসীম খেয়ে গেছেন তবু তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি!

মিঃ জাহেদ বললেন—বিস্ময়কর দস্যু এই বনহুর। স্যার আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি সে কি তবে হাওয়ায় মিশে গেলো।

বললেন ইন্সপেক্টার মিঃ মোহসিন—আপনার চোখের ভ্রমও তো হতে পারে!

মোটেই চোখের ভ্রম নয় মিঃ মোহসিন। আমি নিজের চোখকে কোন সময় অস্বীকার করতে পারিনা। নিশ্চয়ই কোন গোপন স্থানে সে লুকিয়ে পড়েছে সেখানে আমরা তাকে খুঁজে পাবোনা!

একটু হেসে গম্ভীর গলায় বললেন পুলিশ সুপার—যদি সে ঐ বাড়ির মধ্যেই আত্মগোপন করে থাকে তবে নিশ্চয়ই সে এক সময় বাহিরে বের হবে এবং পালাতে চেষ্টা করবে। আমাদের ডি আই বি পুলিশ ঐ বাড়ির চারিদিকে গোপনে ছড়িয়ে আছে।

ড্রাইভ আসনে বসে বনহুর সব শুনতে পাচ্ছিলো একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার মুখে।

মিঃ জাফরীর অফিসে গাড়ি পৌঁছতেই পুলিশ অফিসারত্রয় নেমে পড়লেন।

ড্রাইভ আসন থেকে নামলো দস্যু বনহুর। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ইংরেজিতে কিছু লিখে কাগজখানা গাড়ির গায়ে রেখে তারপর একটি পুলিশ এর হাতে সেটা দিয়ে বললো—যারা এই মুহূর্তে এলেন তাদের যে কোন সাহেবকে দিও।

পুলিশ হেসে বললো—ছুটি নেবে বুঝি?

হাঁ ভাই।

পুলিশ চিঠিখানা হাতে নিয়ে মিঃ জাফরীর অফিসের দিকে চলে গেলো।

সেই ফাঁকে দস্যু বনহুর অফিস গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটি গাড়ি যাচ্ছিলো।

বনহুর হাত তোলে!

গাড়িখানা থেমে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে।

বনহুর গাড়িতে চেপে বসে বলে—ক্লার্ক রোড ১৩নং এ চলো।

ড্রাইভার বলে—আচ্ছা স্যার।

অবশ্য বনহুরের শরীরে তখন পুলিশের পোশাক ছিলো তাই গাড়ির ড্রাইভার অতি সম্মানের সঙ্গে কথা বললো।

পুলিশটা অফিসে প্রবেশ করে ড্রাইভারের দেওয়া চিঠিখানা পুলিশ সুপারের হাতে দেয় স্যার এটা আপনার গাড়ির ড্রাইভার দিলো।

পুলিশ সুপার চিঠিখানা খুলে চোখের সামনে মেলে ধরলেন চিঠিতে লিখা রয়েছে—"অনেক ধন্যবাদ—আমাকে গ্রেপ্তার
করতে গিয়ে অনেক হয়রানি হয়েছেন
সে জন্য ক্ষমা প্রার্থী। আমিই
আপনাদের পৌঁছে দিয়ে গেলাম।"

—দস্যু বনহুর

পুলিশ সুপার চিৎকার করে উঠলেন—দস্যু বনহুর! শীঘ্র যাও, গ্রেপ্তার করো, আমাদের গাড়ি যে চালিয়ে নিয়ে এসেছে সে দস্যু বনহুর।

মিঃ জাফরী পর্যন্ত শোফা ত্যাগ করে লাফিয়ে উঠলেন—দস্যু বনহুর! কোথায়, কোথায় সে?

ততক্ষণে পুলিশ সুপার নিজেই ছুটলেন।

তাঁর পিছনে অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ।

গাড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন—কই ড্রাইভার, সে কোথায়?

যে পুলিশ চিঠিখানা নিয়ে গিয়েছিলো সে ভয় কম্পিত কণ্ঠে বলে—হুজুর ড্রাইভার আমার হাতে চিঠি দিয়ে এখানে ছিলো কিন্তু সে গেলো কোথায়?

মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য অফিসারগণ সবাই এসে দাঁড়াল সেখানে।

মিঃ জাফরী বললেন—যত সহজ মনে করছেন তত সহজ নয় মিঃ আহম্মদ। এবার হেসে বললেন—যাকে গ্রেপ্তার করতে গেলেন সেই কিনা আপনাদের গাড়ি চালিয়ে এলো অথচ আপনারা কেউ একটুও টের পেলেন না। সত্যি সে একটি বিস্ময়। মিঃ আহাম্মদ, আমি যতই এই দস্যুটা সম্বন্ধে গবেষণা করছি ততই আশ্চর্য হচ্ছি।

কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়ছি।

পুলিশ সুপার বলে উঠেন—নিশ্চয়ই সে আশে পাশে কোথাও আছে। তোমরা অনুসন্ধান চালাও.....যাও....

কোন ফল হবেনা মিঃ আহম্মদ। চলুন ভিতরে গিয়ে বসা যাক।

পুলিশ সুপার মিঃ আহাম্মদ এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলেন মিঃ জাফরীর মুখের দিকে।

❑

সর্দার।

কে?

রহমান।

কখন এলে?

এই মাত্র আসছি

কি সংবাদ?

কান্দাই পর্বতমালার কিছু অংশ সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কোন রকম বৃক্ষাদি বা জীব জন্তুর চিহ্ন নাই।

বনহুর সম্মুখের রেকাবী থেকে এক থোকা আংগুর তুলে নিয়ে মুখে ফেলে চিবুতে চিবুতে বললো—হুঁ।

রহমান বলে চললো—সর্দার সেদিন যে শব্দ হয়েছিলো তা সমস্ত কান্দাই শহরকে প্রকম্পিত করে তুলেছিলো। কান্দাইবাসীগণ মনে করেছিলো নিশ্চয়ই কান্দাই পর্বতে অগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটলো। সর্দার আমাদের আস্তানা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিলো। এতো বড় শব্দের কারণ আজ আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম। বড় আশ্চর্য.... একটু থেমে বললো আবার রহমান—সর্দার হামবার্ট কি তার সমস্ত ঘাঁটি ধ্বংস করে ফেলেছে?

সমস্ত ঘাটি ধ্বংস করে না ফেললেও তার আসল জঙ্গল বাড়ি ঘাটি সে বিনষ্ট করে ফেলেছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে কান্দাই পর্বত মালার তলদেশে এমন কোন জায়গা আছে যেখানে হামবার্ট নিশ্চিন্ত মনে আত্মগোপন করে তার কাজ সমাধা করে চলেছে। রহমান গতরাত্রে হামবার্ট এর লোক এক নিরীহ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে তারা মনে করেছে সেই যুবকটিই রংলাল।

সর্দার!

হাঁ রহমান। আমি জানতাম হামবার্ট রংলালকে হত্যার চেষ্টা করবে এবং করলেও তাই।

সর্দার কে সে যুবক ছিলো?

খান বাহাদুর আমির আলী সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র হাসিম কায়েসী তার নাম। ভদ্রলোক উচ্চশিক্ষা লাভ করে সবে মাত্র দেশে ফিরে এসেছিলো। অনেক আশা নিয়ে সে এসেছিলো কান্দাই শহরে চাচার কন্যা মিস নীলাকে

বিয়ে করে চাচার ঐশ্বর্য ভোগ দখল করবে। কিন্তু বেচারী ....মার পড়লে হাঁ শোন রহমান নীলা কি এখন ঠিকভাবে খাওয়া দাওয়া করছে?

না সর্দার।

বনহুর বিছানায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিলো চট করে সোজা হয়ে বসে বললো—এখনও সে খায়নি?

আলী হোসেন তাই বলেছে কাল রাতেও কিছু মুখে দেয়নি আজ সমস্ত দিন নাকি খায়নি.....

ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠে বনহুরের।

রহমান বলে—সর্দার নীলাকে ওখানে রাখাটা সমস্যা হয়ে পড়েছে আমার মনে হয় তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া উচিৎ।

তুমি কিছু বোঝনা রহমান। নীলা এবং আমির আলীকে তাদের বাসভবন থেকে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে হলো হামবার্টের হাত থেকে আপাতত তাদের রক্ষা করা। কারণ হামবার্ট আমির আলীকে হত্যা করে নীলাকে আত্মসাৎ করবে। আমি চাইনা একটা নিষ্পাপ তরুণী এভাবে নির্যাতীতা হয়।

কিন্তু না খেয়ে সে কতদিন বাঁচবে তাই ভাবছি সর্দার।

হু-সেটাই চিন্তার কথা।

রহমান বললো—সর্দার আমার মনে হয় তাকে অন্য কোথাও নিয়ে গেলে হয়তো তার মনের পরিবর্তন আসতো?

বনহুর পুনরায় রেকাবী থেকে এক থোকা আংগুর তুলে নিয়ে চিবুতে চিবুতে বললো—যতক্ষণ আমি শয়তান হামবার্টকে সায়েস্তা করতে না পারবো ততক্ষণ আমির আলী ও তার কন্যা নীলাকে আমাদের দায়িত্বে সাবধানে রাখতে হবে এজন্য প্রচুর সময়ের দরকার হবে। রহমান একটা কথা তোমাকে না বলে পারছি না তুমি আমার শুধু সহকর্মী নও তুমি আমার বন্ধু। বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো।

রহমান বিস্ময় নিয়ে তাকালো তার মুখের দিকে।

বনহুর মুক্ত জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো।

রহমানও এলো তার পাশে!

বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো। তারপর কয়েক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো—রহমান নীলা ভালবাসতো রংলালকে। শুধু ভালবাসাই নয় রংলালকে পাবার জন্য সে সদা সর্বদা উন্মুখ। আমি বুঝতে পারছি রংলালকে না দেখে সে

কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারছেনা এবং সেই কারণে খাওয়া বন্ধ করে ফেলেছে।

সর্দার!

হাঁ এখন বলো কি করে ওকে রংলালের মোহ থেকে ফিরিয়ে আনা যায়।

সর্দার আপনি বলার অনেক পূর্বেই আমি এটা বুঝতে পেরেছিলাম নীলা শুধু রংলালকে ভালই বাসেনি তার জন্য সে জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে এখন তাকে ফেরানো মুস্কিল হবে।

তুমি একটা পরামর্শ দাও রহমান?

সর্দার আমি পরামর্শ দেবো আপনাকে কি যে বলেন।

আমি ভেবে পাচ্ছিনা কি করবো। কান্দাই হত্যা রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে এমন একটা সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়বো ভাবতে পারিনি। একটু থেমে পুনরায় বললো বনহুর—এমন সমস্যা আমার জীবনে বহুবার এসেছে কিন্তু এমন রহস্যময় হয়ে উঠেনি।

সর্দার এক কাজ করলে কেমন হয়? যদি রংলালের হত্যা সংবাদ তাকে দেওয়া যায়। হয়তো দু'একদিন এ ব্যাপার নিয়ে মন খারাপ করবে তারপর....

ঠিক বলেছো রহমান তাই হোক। নীলার জীবন থেকে রংলাল মরে যাক সেই ভাল। হাঁ এই সংবাদ নীলাকে জানাও গত রাতে হামবার্টের অনুচর গোপনে আমির আলী সাহেবের বাসভবনে প্রবেশ করে রংলালকে তার শয়ন কক্ষে হত্যা করে তার মাথাটা কেটে নিয়ে গেছে।

রহমান বললো—আচ্ছা সর্দার তাই বলবো।

রহমান কুর্নিশ জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

বনহুর পায়চারী করে চলে।

এমন সময় নূরী এসে দাঁড়ায়—কি হয়েছে তোমার বলো তো? সব সময় কি এতো ভাব?

বনহুর এবার তার শয্যায় বসে বালিশে ঠেশ দেয়!

নূরী বসে তার পাশে দক্ষিণ হস্তে বনহুরের জামার বোতামটা লাগিয়ে দিতে দিতে বলে—হত্যা রহস্য উদঘাটন করে খুনীকে বন্দী করেছো। এখন পুলিশের কারাগারে। তবু তোমার ভাবনা শেষ হলোনা। এতোদিন ধরে কোথায় ছিলে তাও বললে না?

বনহুর একটু হেসে বললো—হত্যা রহস্য শেষ হয়েছে কিন্তু হত্যা রহস্যের মূল উৎস যেখান থেকে সেই স্থানের সন্ধান এখনও আমি পাইনি। তবে আমার আশা আছে অল্পদিনেই আমি এর সন্ধান পাবো।

এ সব কারণে আমাকে বেশি সময় আস্তানার বাইরে কাটাতে হচ্ছে।

কিন্তু কত দিন আর চলবে তোমার এই হত্যা রহস্য উদঘাটন পালা?

যতদিন না এর মূল স্তম্ভ ভেংগে চুরমার করে ফেলতে সক্ষম হয়েছি। জানো নূরী এই হত্যা রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে আমি নিজেই একটা রহস্য জালে জড়িয়ে পড়েছি।

রহস্য জালে জড়িয়ে পড়েছো?

হাঁ নূরী।

সে কেমন?

বলছি শোন অবশ্য তোমার কাছে গল্পের মত মনে হবে। এক খান বাহাদূর সাহেবকে এ হত্যার রহস্যের ব্যাপারে সন্দেহ হওয়ায় আমি তাঁর বাগানের মালি হিসাবে কাজ বেছে নিলাম। তখনও জানতাম না খান বাহাদূরটির এক তরুণী কন্যা আছে। জানলে অবশ্য অন্য উপায় অবলম্বন করতাম। বাগানে কাজ করছি হঠাৎ এক নারীকণ্ঠের আহ্বান, মালী কয়েকটা ফুল দাও তো ফিরে তাকাতেই এক জোড়া চোখ আমার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করলো। চটকরে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলাম না কারণ তরুণীর চোখ দুটো তখনও আমার মুখে স্থির হয়ে আছে।

তারপর?

তারপর আমি কয়েকটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তার হাতে দিলাম। আমি থনই বুঝতে পারলাম; যে ভয় আমার মনে ছিলো তাই হলো। বড় রাগ হলো নিজের চেহারাটার জন্য। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছি আর কাজ করছি আবার ডাক এলো, মালী এদিকে শোন।

চমৎকার তো?

চমৎকার না ছাই।

তরুণীই বুঝি ডাক দিলো।

তাছাড়া কার এমন গরজ যে মালিকে ডাকবে। ফিরে তাকিয়ে দেখি সেই তরুণী ডাক বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছেন। আমি হাতের কাজ রেখে উঠে দাঁড়ালাম। তরুণী ডাকলো—এদিকে এস।

তুমি এগিয়ে গেলে?

না গিয়ে উপায় ছিলোনা।

তারপর।

আমি গিয়ে দাঁড়াতেই দুটি সহানুভূতি ভরা দৃষ্টি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো। তরুণী আমার নাম, বাড়ি কোথায়, বাড়িতে কে কে আছে, কত টাকা এখানে মাইনে পাই.....

বুঝলাম এতোদিন সেখানেই তবে কাটালে?

কথার শেষ শুনলেনা নূরী?

না আর শুনতে আমি চাইনা তুমি আর রহমান যখন কথাবার্তা বলছিলে তখন আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি সবকিছু শুনেছি।

তা হলে তো সব শুনেছো নূরী। এবার বলো কি করবো? মেয়েটি তার রংলালকে ছাড়া.....

কিছুতেই বাঁচবেনা এইতো? বনহুরের কথার মাঝখানে নূরী বলে উঠলো।

কতকটা তাই।

আর স্বয়ং দস্যু বনহুর? তার মনে কি মেয়েটি রেখাপাত করেনি? যার সঙ্গে এতো.....

নূরী. এত নরম মন দস্যু বনহুরের নয় যে সহজেই দাগ পড়বে। তবে সহানুভূতি আছে ওর প্রতি আমার। আমি চাই সে সুস্থ মনে স্বাভাবিকভাবে রংলালকে ভুলে যায়।

বনহুর তুমি পুরুষ মানুষ তাই এ কথা বলতে বা ভাবতে পারো। নীলা যে রংলালকে ভালবেসেছে তাকে সে অন্তর দিয়েই মনে প্রাণে কামনা করে এসেছে। হঠাৎ যদি তাকে সে হারায় এর চেয়ে ব্যথা নারীর জীবনে আর কিছু নেই।

নূরী তুমি দেখছি সুন্দর কথা বলতে শিখেছো। তুমিই বলে দাও কিভাবে নীলাকে রংলালের চিন্তা থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়?

তুমিই তো বলে দিলে রংলাল মরে গেছে বলতে কিন্তু....

না না আর কিন্তু নয় নীলার জীবন থেকে রংলাল মরে গেছে এটাই আমি চাই। বনহুর উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী শুরু করে।

এমন সময় জাহেদ ছুটে আসে সেখানে—আম্মু আম্মু দেখবে এসো একটা বাঘের বাচ্চা শিকার করেছি। বাপু তুমিও আছো বেশ মজা হবে দেখবে চলো।

বনহুর জাভেদকে তুলে নেয় কোলে, গালে চুমু দিয়ে বলে—চলো কোথায় তোমার শিকার?

বনহুর আর নূরী জাভেদের সঙ্গে বেরিয়ে আসে বাইরে।

বনহুরের একজন অনুচর পাহারা দিচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। একটা ছোট বাচ্চা বাঘ পড়ে আছে কাৎ হয়ে। এখনও তার পেটে তীর বিদ্ধ হয়ে আছে।

জাভেদ বললো—বাপু আমি এই বাঘটা মেরেছি।

সাবাস! চমৎকার তো? বড় হয়ে আরও বড় বড় বাঘ মারবে কেমন?

নূরী বলে উঠে—বাপের মতই ছেলে হবে তাতে আর আশ্চর্য কি আছে।

জাভেদ বাঘের বাচ্চাটা কাঁধে তুলে নিয়ে চলে যায়।

বনহুর বলে—নূরী চলো ঝর্ণার ধারে গিয়ে বসি। আজ পূর্ণিমা?

চলো।

নূরী আর বনহুর পাশাপাশি এগিয়ে চলে।

অরণ্যের রাজা দস্যু বনহুর।

আর রানী নূরী।

দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলে ওরা।

অদূরে ঝর্ণা ধারা কলকল করে বয়ে চলেছে।

ঝর্ণার পাশে এসে দাঁড়ায় ওরা দু'জনা।

বনহুর আর নূরী।

পূর্বাকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি দিচ্ছে।

বনহুর বললো—বসো।

নূরী বসে বনহুরের হাত ধরে বসিয়ে দিলো নিজের পাশে।

বনহুর বলে—অপূর্ব।

কি?

ঐ চাঁদ। নূরী। কতদিন এমনি করে ঝর্ণার পাশে তুমি আর আমি বসিনি। খুব ভাল লাগছে আমার।

সত্যি!

হাঁ নূরী।

দস্যু সম্রাট দেখছি আজ নতুন রূপ নিয়েছে।

হাঁ এই মুহূর্তে আমি দস্যু নই....

তবে কি?

তোমার প্রিয়তম।

নূরী বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে।

জোছনার আলোতে বনহুর নূরীর চোখ দুটোর দিকে তাকায় গভীর আবেগে।

ঐ মুহূর্তে একটা জাল এসে তার চারদিক ঘিরে ফেলে। বনহুর নূরীকে দ্রুত হাতে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু ততক্ষণে তার চার পাশে জালের বেষ্টনী তাকে জড়িয়ে ফেলেছে।

নূরী চিৎকার করে উঠলো।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো কয়েকজন লোক তাকে লক্ষ্য করে বিরাট একটা জাল ছুড়ে মেরেছিলো, লোকগুলো এবার তাকে ধরবার জন্য চারপাশ থেকে এগিয়ে আসে।

জোছনার আলোতে লোকগুলোকে বনহুর চিনতে পারলো। এরা পুলিশ ফোর্স। প্রত্যেকের সঙ্গেই অস্ত্র রয়েছে।

একজন বললো—জীবন্ত গ্রেপ্তার করো।

বনহুর ফিরে তাকাতেই দেখলো খাকি পোশাক পরা মিঃ জাফরী তাঁর হাতে মেশিন গান।

দু'জন পুলিশ নূরীকে ধরতে যাচ্ছিলো।

মিঃ জাফরী বললেন—ওকে ছেড়ে দাও।

বনহুর জালের মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

পুলিশ ফোর্স বনহুরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেললো।

এ মুহূর্তে বনহুর অস্ত্র বিহীন রিক্ত।

জোছনার আলোতে বনহুর তাকালো নূরীর দিকে।

নূরী দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে।

পুলিশ ফোর্স বনহুরের হাতে হাত কড়া পরিয়ে দিলো? তারপর ওকে নিয়ে চললো চার পাশে ঘেরাও করে!

গভীর জঙ্গল।

প্রায় মাইল কয়েক চলার পথ প্রশস্ত পথ আছে। সেই পথে মিঃ জাফরী এবং পুলিশ বাহিনীর গাড়ি অপেক্ষা করছে। শুধু এক দিনের প্রচেষ্টা নয় বেশ কিছুদিন হলো মিঃ জাফরী কান্দাই জঙ্গলে দস্যু বনহুরের সন্ধানে আত্মগোপন করে ঘোরা ফেরা করছে।

মিঃ জাফরী জানতেন এই জঙ্গলের মধ্যে কোথাও আছে তার আস্তানা। একদিন তার এ প্রচেষ্টা সফল হবে এও জানতেন তিনি।

কান্দাই জঙ্গল ছাড়াও কান্দাই শহরের চৌধুরী বাড়ির আশে পাশেও গোপনে গোয়েন্দা পুলিশ লুকিয়ে থাকতো। যে কোন সময় দস্যু বনহুর আসতে পারে। সেদিনের অপমানের পর মিঃ জাফরী শপথ নিয়েছিলেন কান্দাই জঙ্গলে আত্মগোপন করে তবু দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করবেন।

হিংস্র জীব জন্তু ভয়কে তিনি বিসর্জন দিয়েছিলেন মন থেকে। তার পুলিশ বাহিনীকেও তিনি এ ব্যাপারে হুশিয়ার হয়ে কাজ করতে বলেছিলেন।

এতো সহজে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবেন ভাবতে পারেনি মিঃ জাফরী।

চলতে চলতে বললেন মিঃ জাফরী—বনহুর!

বলুন মিঃ জাফরী?

মেয়েটি কে?

আমার স্ত্রী।

তোমার স্ত্রী?

হাঁ।

আমরা জানি চৌধুরী কন্যা মনিরা তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু তোমার তাহলে....

নূরীও আমার বিবাহিতা স্ত্রী।

আর খান বাহাদুর আমির আলীর কন্যা মিস নীলাও তোমার স্ত্রী?

মিঃ জাফরী আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করেছেন বলে যাতা বলবেন এটা ভদ্রতা নয়। চলতে চলতে দাড়িয়ে পড়ে বনহুর।

তার চার পাশে উদ্যত মেশিন গান আর রাইফেল সজাগভাবে স্থির হয়ে আছে।

মিঃ জাফরীর হাতের মেশিন গানও বনহুরের দিকে তাক করা রয়েছে, তিনি একটু হেসে বললেন—সৌন্দর্যের মোহে নারীমন জয় করলেই তাকে স্ত্রী বলা যায়না বনহুর। আমি কেনো সবাই জানে তুমি কত নারীকে হরণ করে তাদের সতীত্ব নষ্ট করেছো....

মিঃ জাফরী!

বড্ড আঁচ লেগেছে না? কত অসহায় নারীর ইজ্জৎ তুমি লুটে নিয়েছো দস্যু.....

বনহুর নিজের শৃঙ্খলাবদ্ধ হাত দু'খানার দিকে তাকিয়ে নিজকে সংযত করে নিলো। চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে অধর দংশন করলো বনহুর।

মিঃ জাফরী বললেন—কোন জবাব দিলে না তো?

আজ নয়, যেদিন আমার হাত দু'খানা মুক্ত থাকবে সেদিন দেবো।

হাসলেন মিঃ জাফরী।

ততক্ষণে তারা প্রায় রাস্তার কাছাকাছি এসে গেছে।

অদূরে গাড়িগুলো অপেক্ষা করছিলো।

মিঃ জাফরী এবং আরও তিনজন পুলিশ অফিসারসহ সম্মুখের গাড়িখানাতে উঠে বসে।

পুলিশ ভ্যানগুলোতে চেপে বসলো পুলিশ বাহিনী। সম্মুখের গাড়িখানাকে ঘেরাও করে এগিয়ে চললো ভ্যানগুলো।

গভীর জঙ্গল পেরিয়ে তারা মুক্ত আকাশের নিচে এসে পড়েছে। সোজা পথ ধরে গাড়িগুলো বেগে অগ্রসর হচ্ছে।

সম্মুখ গাড়ির পিছন আসনে দস্যু বনহুর তার ঠিক পাশে, মিঃ জাফরী ও আরও তিনজন পুলিশ অফিসার।

সবাই সজাগভাবে অস্ত্র বাগিয়ে বসে আছে।

গাড়িখানার দু'পাশে দু'খানা পুলিশ ভ্যান। যাতে বনহুর গাড়ি থেকে লাফিয়ে পালাতে না পারে। পিছনে আরও দু'খানা গাড়ি সর্তকতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।

এখানে যখন বনহুরকে নিয়ে পুলিশ বাহিনী কান্দাই শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তখন কান্দাই আস্তানায় নূরী ছুটে গিয়ে রহমানকে বলে—রহমান সর্বনাশ হয়েছে!

রহমান তখন তার কন্যা ফুল্লরাকে আদর করছিলো। চমকে উঠে বলে সে—কি হলো?

বনহুরকে ধরে নিয়ে গেছে?

সর্দারকে ধরে নিয়ে গেছে?

হাঁ একদল পুলিশ ফোর্স গাছের আড়ালে ঝোপে জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিলো তারা তাকে জাল দিয়ে ঘেরাও করে গ্রেপ্তার করেছে—

রহমান তাড়াতাড়ি ফুল্লরাকে নাসরিনের কোলে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

নূরী পথরোধ করে দাঁড়ায়—থামো রহমান, তুমি পারবেনা তাকে ফিরিয়ে আনতে। অসংখ্য পুলিশ ফোর্স রয়েছে তাদের হাতে আছে মেশিনগান, রাইফেল? আমি নিজের চোখে দেখেছি এসব অস্ত্র।

ব্যস্ত কণ্ঠে বলে রহমান—নূরী পথ ছাড়ো। আমি এই মুহূর্তে আস্তানায় বিপদ সংকেত ধ্বনি করবো। সবাই মিলে আক্রমণ চালাবো পুলিশ বাহিনীর উপর। অস্ত্র আমাদেরও আছে—

নূরী ব্যাকুল গলায় বলে উঠে—নানা তুমি জানোনা রহমান তোমরা যদি পুলিশ বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাও তাহলে ওরা বনহুরকে জীবিত রাখবেনা। যখন দেখবে ওরা পারছেনা তখন ওকে ওরা হত্যা করে ফেলবে। আমি জানি ওকে জীবিত রাখতে পারেনা।

তা হলে কি করবো?

আমিও বলতে পারছিনা রহমান এখন আমাদের কর্তব্য কি?

নাসরিনের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

শিশু ফুল্লরা তখন কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে।

নূরী বলে—রহমান অপেক্ষা করো। আমার মন বলছে তাকে ওরা ধরে রাখতে পারবেনা।

পুলিশ ভ্যানগুলো স্পীডে এগিয়ে চলেছে।

কারো মুখে কোন কথা নাই।

মিঃ জাফরী ভাবছে দস্যু বনহুরকে এমন সহজভাবে গ্রেপ্তার করা যাবে তা তিনি কল্পনা করেন নি। তিন লক্ষ টাকার মোহ তার তেমন নেই দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করার আনন্দটাই তার অনেক বড়।

অবশ্য তার সঙ্গী অফিসারগণ তিন লক্ষ টাকার চিন্তাই করছিলেন। কত করে করে ভাগে আসবে এর হিসাব করছিলেন তারা মনে মনে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে গাড়িগুলো কান্দাই নদীর ব্রিজের উপর দিয়ে চলেছে বিরাট ব্রিজ প্রায় দু'মাইল নিয়ে এ ব্রিজটা।

নীচে প্রখর স্রোত ধারা বয়ে যাচ্ছে।

আচমকা বনহুর ড্রাইভারের মাথায় তার শৃঙ্খলাবদ্ধ হাত দিয়ে আঘাত করতেই গাড়ি ব্রিজের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কাৎ হয়ে যায়। বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে লাফিয়ে পড়ে খরস্রোতা নদীর বুকে।

ড্রাইভার হ্যাণ্ডেলের উপর ঢলে পড়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ জাফরী এবং তার সঙ্গী পুলিশ অফিসারদের রাইফেল মেশিন গান গর্জে উঠে।

এতোদ্রুত এই কাণ্ড ঘটে যায় যে কেউ কোন কিছু উপলব্ধি করতে পারেনা।

মিঃ জাফরী এবং পুলিশ অফিসার এর গাড়ি থেকে পালিয়ে নেমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ভ্যানগুলি থেমে পড়েছিলো। পুলিশ ফোর্স নেমে পড়লো সবাই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তারপর তারা এলোপাথারী গুলি ছুড়তে শুরু করলো।

এমনভাবে মিঃ জাফরী পরাজিত হবেন ভাবতে পারেননি। তার ইচ্ছা হলো মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদেন। নিজের হাত নিজে কামড়াতে লাগলেন। কারণ এর আগেও বনহুর কয়েকবার পুলিশ ফোর্সের বুহ্য ভেদ করে সামলাতে সক্ষম হয়েছে। অনেক সাবধানতা সত্ত্বেও বনহুরকে গ্রেপ্তার করে তারা কারাগার পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়নি।

রাগে দুঃখে মিঃ জাফরী মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে থাকেন।

অন্যান্য পুলিশ অফিসার এবং পুলিশ বাহিনী যেন হাবাগোবা বনে যায়।

মিঃ জাফরীর আদেশে প্রায় ঘন্টা খানেক ধরে অবিরাম নদী বক্ষে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ চললো।

তারপর এক সময় বিফল মনে ফিরে চললেন—মিঃ জাফরী তারদল বল নিয়ে।

গাড়িতে বসে বললেন মিঃ জাফরী আমাদের হাত থেকে পালাতে সক্ষম হলেও নদী বক্ষের প্রখর স্রোতধারা থেকে দস্যু রক্ষা পাবে না। মৃত্যু তার সুনিশ্চিত কারণ তার হাত দু'খানাই শুধু শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলোনা। কোমরেও মোটা শিকল আটকানো রয়েছে।

বনহুর যখন সংজ্ঞালাভ করলো তখন সে দেখতে পেলো একটি নৌকার মধ্যে সে শুয়ে আছে। তার পাশেই বসে আছে এক বৃদ্ধ, প্রথম নজরেই তাকে কোন মহৎ মহান ব্যক্তি বলে মনে হলো! মাথার চুল সম্পূর্ণ সাদা। মুখে কোন দাড়ি গোঁফ নেই। চোখে পুরু কাঁচের চশমা আরও দু'জনকে দেখতে পেলো বনহুর। তারা নৌকার মাঝি হবে বলে ধারণা হলো।

বনহুরকে চোখ মেলতে দেখেই বৃদ্ধ বলে উঠলেন—এখন কেমন বোধ করছো বাবা?

বনহুর কোন জবাব না দিয়ে তাকায় ফ্যাল ফ্যাল করে। তার হাত দু'খানা মুক্ত হলো কি করে। কোমরে বাঁধা সেই শিকলটাই বা গেলো কোথায়। সে

যখন ব্রিজের উপর থেকে লাফিয়ে পড়েছিলো তখন তার হাতে এবং কোমরে লৌহ শিকল আটকানো ছিলো।

ওকে নীরব থাকতে দেখে বলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি—জানি কোন দস্যু তোমাকে এভাবে হাত এবং কোমর লৌহ শিকলে বেঁধে নদীতে নিক্ষেপ করেছিলো। ভাগ্যিস আমি ভোরে নৌকার ধারে বসে ওজু করতে গিয়ে তোমাকে দেখে ফেলেছিলাম। যাক্ পরে সব বলবো এখন একটু বিশ্রাম করো। বৃদ্ধ এবার নৌকার বাইরে তাকিয়ে বললেন—ওরে নসু এক গেলাস গরম কফি নিয়ে আয়।

বলতে না বলতে শব্দ ভেসে এলো—আসছি হুজুর।

বনহুর তখন উঠে বসার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো। তবু শুয়ে থেকেই বললো—আমি বেশ সুস্থ বোধ করছি।

তবু কিছুটা বিশ্রাম নেওয়া দরকার। ওরে নসু হলো, নিয়ে আয়।

আসছি—একটু পরে একটা বয় এক গেলাস কপি হাতে নৌকার ভিতরে প্রবেশ করে।

বৃদ্ধ নসুর হাত থেকে কফির গেলাসটা নিয়ে বনহুরের মুখে ধরেন খাও বাবা!

বনহুর উঠে বসতে যায়।

বৃদ্ধ ব্যস্ত কণ্ঠে বলেন—না না শুয়ে শুয়েই খাও আমি তোমাকে তুলে খাওয়াচ্ছি।

বনহুরের দু'চোখ ভরে পানি এসে যায়, মনে পড়ে তার আব্বা চৌধুরী সাহেবের কথা। তিনি আজ বেঁচে থাকলে এমনি করে হয়তো দুধের গেলাস তার মুখে তুলে ধরতেন। বনহুর আপত্তি করে না বৃদ্ধার হাত থেকে কফি খেতে থাকে।

অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও কিছু সময় বনহুর চুপ চাপ শুয়ে রইলো।

বৃদ্ধ তার ছোট্ট একটা বাক্স বের করে কিছু ঔষধ খেতে দিলো। এটা খেলে সব ক্লান্তি অবসান দূর হবে।

বনহুর খেলো।

এবার কিন্তু সে উঠে বসলো নৌকার মধ্যে!

নৌকাখানা তখনও দুলে দুলে এগিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে সে জানালো। হঠাৎ বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করবে তাও বিবেকে বাঁধে। অনেকগুলো প্রশ্ন তার মনে তোল পাড় শুরু করে দিয়েছে।

বনহুর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করে বললো — তোমাদের নৌকায় ডাকাত পড়েছিলো বুঝি?

বনহুর ঢোক গিয়ে বলে হাঁ।

সব ছিনিয়ে নিয়ে তোমাকে হাত কোমর বেঁধে পানিতে ফেলে ছিলো মনে হচ্ছে?

হাঁ আমার ঠিক সব কথা মনে নেই কারণ আমি তখন ঘুমিয়েছিলাম কিনা।

ও এবার বুঝতে পারছি। তোমরা ঘুমিয়ে ছিলে?

আমরা মানে আমি একাই ছিলাম নৌকায়। আমার যতদূর মনে হয় নৌকার মাঝিরাই আমাকে নদী বক্ষে ফেলে দিয়েছে তবে হাঁ আমার হাত কোমর যখন ওরা বাঁধে তখন কিছু কিছু দেখেছি। আচ্ছা আমার হাত এবং কোমরের বাধন কি করে খুলে গেলো?

আমার নৌকার মাঝিদের কাছে লোহার বাটাল এবং সাড়াসী আছে। ওরাই অনেক চেষ্টা করে তোমার লৌহ শিকলগুলো খুলে ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

এতোক্ষণে বনহুর বুঝতে পারলো তার হাত এবং কোমরের বাধন কি করে খোলা হয়েছে। বনহুর মনে মনে দয়াময়কে অশেষ ধন্যবাদ জানালো! তিনিই রক্ষা কর্তা, কতবার তাকে মৃত্যু থেকে তিনি রক্ষা করেছেন!

বনহুরকে ভাবতে দেখে বললো বৃদ্ধ—তুমি কিছু ভেবোনা বাবা। জিনিস পত্র যা গেছে তার জন্য দুঃখ নেই জীবন বেঁচে গেছে এটাই বড়।

বনহুর বললো—হাঁ ঠিক বলেছেন।

বাবা সবই ঐ খোদাতালার দয়া। কান্দাই থাকতাম দেশে যাচ্ছি। কিছু টাকা পয়সা করেছিলাম ব্যবসা বাণিজ্য করে। অবশ্য আমি কোন দিন অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করিনি তবু একটা ভয়।

ভয়! কিসের ভয় আপনার?

ঐ ভয়েই তো আমি শহর ছেড়ে গ্রামে যাচ্ছি। সেখানে তবু নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো।

কিসের ভয়ে আপনি গ্রামে যাচ্ছেন তাতো বললেন না?

এদিক ওদিক তাকিয়ে চাপা কণ্ঠে বলেন বৃদ্ধ দস্যু বনহুরের....

দ-স্যু-ব-ন হু-রে-র.... ভয়ে?

হাঁ বাবা। তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো কান্দাই থেকে আজকাল জীবন্ত মানুষ উধাও হয়ে যাচ্ছে। খুন খারাবীর কথাই নাই....

বনহুর একটু শব্দ করলো—হুঁ।

বৃদ্ধ বলে চলেছেন—খান বাহাদুর আমির আলী আর তার মেয়ে নীলাকে একরাতে দস্যু বনহুর হরণ করে নিয়ে গেছে। তারপর খান বাহাদুরের একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র হাসিম কায়েসীকে হত্যা করে গলা কেটে মাথাটা নিয়ে গেছে। তাই আমি আর—

তাই আপনি দস্যু বনহুরের ভয়ে শহর ত্যাগ করে গ্রামে চলে যাচ্ছেন?

হাঁ বাবা কি জানি কখন দস্যু বনহুর আমার প্রতি নজর দেবে। তাই ভালয় ভালয় চলে যাচ্ছি—

একটু হেসে বললো বনহুর—দস্যু বনহুরের গতি শুধু শহরেই সীমাবদ্ধ নয় গ্রাম হতে গ্রামাঞ্চলেও সে যখন তখন আবির্ভূত হতে পারে।

তাহলে আমি কোথায় যাবো বাবা? দস্যু বনহুর সম্বন্ধে তুমি দেখছি সব জানো।

হাঁ কারণ আমিও তো আপনার মতই বিপদগ্রস্থ।

সত্যি! সত্যি তুমিও আমার মত বিপদগ্রস্থ মানে দস্যু বনহুরের ভয়ে— শহর ছেড়ে পালাচ্ছো বুঝি?

হাঁ। তবে এখন আর কোন ভয় নেই আমার।

সব জিনিস দস্যু লুটে নিয়েছে তোমার?

হাঁ।

বৃদ্ধ বললো—বাবা দুঃখ করোনা সব গেছে আবার হবে চলো আমাদের গ্রামের বাড়িতে চলো তোমাকে আমি নিজের ছেলে বলে গ্রহণ করেছি।

বৃদ্ধ বনহুরকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খুব আদর যত্ন করে রাখলো।

এখানে এসেও সোনা দানা কোথায় লুকিয়ে রাখবে ভেবে অস্থির হয়ে পড়লেন। বারবার তিনি বনহুরকে ডেকে বলতে লাগলেন— বাবা কোথায় এসব লুকিয়ে রাখবো বলোনা? মাটির তলায় না সিন্ধুকে কোথায় রাখবো এসব ধন সম্পদ?

বনহুর হাসলো, বললো—আপনি আমাকে এতো বিশ্বাস করছেন, আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি আপনার ধন সম্পদ নিয়ে আপনি যে ভাবে রাখতে চান রাখুন। দস্যু বনহুর আপনার কোন ক্ষতি করবেনা।

সত্যি বলছো বাবা?

হাঁ। তাছাড়া আপনার ভয়ের কোন কারণও নেই। দস্যু বনহুর কোনদিন সৎ উপায়ের অর্জিত ধন সম্পদ লুটে নেয় না। আপনি নিশ্চিন্ত এ ব্যাপারে।

বনহুর কথাগুলো বলে চলে গেলো নিজের কক্ষে। এই গ্রামে আসার বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাকে এ কক্ষেই থাকতে দিয়েছিলেন।

দু'দিন কেটে গেলো হঠাৎ একদিন ভোরে বৃদ্ধ বনহুরের ঘরে গিয়ে দেখলেন সে নাই। গেলো কোথায় অনেক খোঁজা-খুজি করেও তার সন্ধান মিললোনা।

বৃদ্ধ প্রায় কেঁদে ফেললেন ঠিক ঔ মুহূর্তে চাকর এসে একটা ভাজ করা কাগজ তার হাতে দিয়ে বললো—ঐ যুবকটি যে ঘরে থাকতো সেই ঘরের বিছানায় বালিশের তলায় ছিলো।

বৃদ্ধ ভাঁজ করা কাগজখানা খুলে পড়তে লাগলেন, কাগজে লিখা ছিলো—

শ্রদ্ধেয়, আমার জীবন রক্ষা করেছেন এ
জন্য আমি চিরদিন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ
থাকবো। বিপদ মুহূর্তে আমাকে স্মরণ
করবেন ঠিক এসে হাজির হবো!

আপনার সন্তান সম—
'দস্যু বনহুর'

বৃদ্ধের কম্পিত হাত থেকে চিঠিখানা খসে পড়ে ভূতলে। ভয় বিবর্ণ মুখে বলেন তিনি—যার ভয়ে আমি শহর ছেড়ে গ্রামে এসেছিলাম সেই দস্যু বনহুরকেই আমি নৌকায় করে আমার বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম! আপন মনেই বলে চলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। প্রথমে পাংশু বর্ণ ধারণ করে তারপর ধীরে ধীরে প্রফুল্ল আনন্দ উজ্জল হয়ে উঠে তার মুখখানা, তিনি বলে উঠেন—ওরে তোরা শুনে যা, ওরে তোরা শুনে যা দস্যু বনহুর আমার ছেলের মত। আমার বাড়িতে সে এসেছিলো আমি তাকে নৌকায় করে নিয়ে এসেছিলাম....

বাড়ির সবাই এসে তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো। বৃদ্ধের কথা শুনে তো সবাই হতবাক, বলেন কি দস্যু বনহুর তাদের এই গ্রামে এসেছিলো। বিস্ময় ভয় আর আতঙ্ক ফুটে উঠে সকলের চোখে মুখে!

বৃদ্ধ বলে চলেছেন—দস্যু বনহুর কি লিখে গেছে শোন সে আমার কাছে কৃতজ্ঞ। যখন আমি বিপদে পড়বো তাকে স্মরণ করলেই এসে হাজির হবে। সে আমার সন্তান সম, দস্যু বনহুর আমার সন্তান হবে এ কম কথা নয়.....

এখানে যখন দস্যু বনহুরকে নিয়ে তোল পাড় চলেছে তখন বনহুর ফিরে চলেছে তার আস্তানা অভিমুখে।

প্রথমে গরুর গাড়ি তারপর রেল পরে মোটর গাড়ি।

বনহুর সমস্ত দিন বিভিন্ন যানবাহনে চলার পর এক সময় ফিরে আসে তার আস্তানায়।

নূরী বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদছিলো।

রহমান তার অনুচরগণ সহ চলে গিয়েছিলো সর্দারের খোঁজে পুলিশ বাহিনী সর্দারকে কৌশলে পাকড়াও করে নিয়ে গেছে আর তারা নিশ্চিন্ত বসে থাকবে এ কখনও হতে পারে না। রহমান তাদের শহরের আস্তানায় গিয়েই জানতে পারে সর্দারকে তারা রাতের বেলায় গ্রেপ্তার করে আসলেও কান্দাই জেল বা হাঙ্গেরী কারাগার পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। ব্রিজের উপর থেকে নদী বক্ষে লাফিয়ে পড়েছিলো বনহুর।

কথাটা শুনে রহমান খুশি হওয়ার চেয়ে চিন্তিত হয়েছিলো বেশি কারণ কান্দাই নদীর গভীরতা যেমন বেশি তেমনি প্রখর স্রোত। নূরীর মুখে শুনে ছিলো রহমান সর্দারকে জাল বেষ্টনী দ্বারা ঘেরাও করে তার হাত এবং কোমরে লৌহ শিকলে আবদ্ধ করেছিলো। রহমান এ কারণেই বেশি দুচিন্তা গ্রস্থ হয়ে পড়েছিলো।

কান্দাই শহরের আস্তানায় গিয়ে রহমান দলবলসহ জেলের বেশে কান্দাই নদীর বুকে নৌকা নিয়ে সন্ধান চালিয়েছিলো। যদি সর্দার কোনক্রমে নদী বক্ষে ভেসে থাকতে সক্ষম হয়। অবশ্য বনহুরের হাত দু'খানা মুক্ত থাকলে তারা এমন চিন্তিত হতোনা।

নূরী তো কেঁদে কেটে আকুল হয়ে পড়েছিলো।

ঐ সময় হঠাৎ কে যেন তার পিঠে হাত রাখলো। পরক্ষণেই তার অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর—নূরী।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে তাকায়—তুমি! তারপর বুকে মুখ গুঁজে বলে উঠে—জানতাম কেউ তোমাকে আটকে রাখতে পারবে না।

বনহুর নূরীর অশ্রুসিক্ত মুখখানা তুলে ধরে বলে—জানতেই যদি কেউ আমাকে আটকে রাখতে পারবে না তবে কাঁদছিলে কেনো? চোখে অশ্রু কেনো তবে বলো?

নূরী বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলে—ও কিছু না। হুর কি করে তুমি পুলিশের ব্যূহভেদ করে পালিয়ে এলে?

তোমার চোখের অশ্রু আমাকে পালাতে সক্ষম করেছে নূরী।

বনহুর!

বলো?

আর আমি তোমাকে আস্তানার বাইরে নিয়ে যাবোনা।

হেসে বলে উঠে বনহুর—তুমি বড্ড অবুঝ নূরী।

না না, বার বার আমার মনে হচ্ছিলো কেনো তোমায় আমি ঝর্ণার ধারে নিয়ে গিয়েছিলাম! কেনো আমি তোমাকে নিয়ে আনন্দ উপভোগ করতে চেয়েছিলাম। হুর, যদি তুমি ফিরে না আসতে তাহলে আমি আত্মহত্যা করতাম.....

নূরী কোন সময় অমন কথা মুখে আনবেনা বা চিন্তা করবে না। তুমি তো জানো যে কোন মুহূর্তে আমার জীবন বিপন্ন হতে পারে তাই বলে.....

ও কথা বলো না হুর। আমি ভাবতে পারি না তোমাকে হারানোর কথা। তুমি যে আমার জীবন....শুধু আমার নও মনিরা আপাও যে তোমাকে হারালে কেঁদে কেঁদে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

বনহুর এবার এসে বলে—তোমরা চিরদিন আমাকে ধরে রাখতে পারবে? আমিও তো মানুষ। জন্মেছি মরতেও হবে আমাকে। জানো সেদিন আমি মৃত্যুর হাত থেকে অদ্ভুতভাবে বেঁচে গেছি। এক বৃদ্ধ আমাকে রক্ষা করেছেন...

বলবে আমাকে সব কথা?

বলবো

বনহুর সব ঘটনা বলে, নূরী বিস্ময় নিয়ে শুনে যায়।

আস্তানায় একটা নিরান্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো। বনহুর ফিরে আসায় আবার আনন্দ স্রোত বয়ে চললো।

কায়েস বনহুরের শহরের আস্তানায় সংবাদটা জানিয়েছিলো।

শহরের আস্তানার অনুচরগণ এক অন্ধকারময় বিষাদ অবস্থায় প্রহর গুণছিলো তারা যখন জানতে পারলো তাদের সর্দার সুস্থ শরীরে কান্দাই আস্তানায় ফিরে এসেছে, তখন সবার মুখে হাসি ফুটলো।

লোক ছুটলো কান্দাই নদী বক্ষে নৌকা নিয়ে যেখানে আজ ক'দিন যাবৎ রহমান সর্দারের সন্ধান করে ফিরছে।

যখন রহমান হতাশ হয়ে পড়েছে। তখন কান্দাই শহরের আস্তানা থেকে লোক এলো শুভসংবাদ নিয়ে। সর্দার জীবিত আছে এবং ভাল আছে শুনে

রহমান খুশিতে আত্মহারা হয়ে ফিরে এলো প্রথমে কান্দাই শহরের আস্তানায় তারপর কান্দাই জঙ্গল আস্তানায়। রহমান এসে দাঁড়াতেই বনহুর রহমানকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

রহমানের চোখে আনন্দের অশ্রু ঝরে পড়লো।

প্রথমেই বনহুর জিজ্ঞাসা করলো—রহমান খান বাহাদুর ও তাঁর কন্যা নীলা কেমন আছে!

রহমান বললো—খান বাহাদুর ভালই আছেন, তিনি স্বাভাবিকভাবে নাওয়া খাওয়া করছেন কিন্তু....

বলো কিন্তু কি?

নীলার অবস্থা ভাল নয়।

বনহুর দু'চোখ বিস্ফারিত করে তাকালো রহমানের মুখে।

রহমান বললো আবার———নীলা সব সময় রোদন করছে! অনেক বলে কয়েও তাকে কিছু খাওয়ানো সম্ভব হচ্ছে না একটু মুখে দেয় তা যৎসামান্য।

বনহুরের মুখমণ্ডলে গভীর একটা চিন্তা রেখা ফুটে উঠে।

রহমান একটু ইতস্ততঃ করে বলে—সর্দার নীলাকে রংলালের মৃত্যু সংবাদটা.....কথা শেষ না করেই থেমে পড়ে সে।

বনহুর বলে উঠে—হাঁ আমারও তাই মনে হচ্ছে রহমান সংবাদটাই তাকে বেশি উদভ্রান্ত করে তুলেছে। একটু থেমে বলে —আচ্ছা যাও আমি চিন্তা করে দেখবো কি করা যায়।

রহমান কুর্নিশ জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

নূরী বনহুরের জামার অস্তিন চেপে ধেরে—বনহুর তুমি না বললেও আমি সব শুনেছি—রহমান আমাকে সব খুলে বলেছে। একটি মেয়ের জীবন তুমি এভাবে নষ্ট করতে পারো না। আমি জেনেছি নীলা রংলালকে ছাড়া বাঁচতে পারে না! যখন সে জানতে পেরেছে রংলালকে কে বা কারা হত্যা করেছে তখন নীলা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলো। তারপর থেকে নাকি সে নাওয়া খাওয়া এক রকম ছেড়েই দিয়েছে।

তুমিই বলো আমি কি করতে পারি?

ভুল তোমার প্রথমেই হয়েছে কারণ যখন নীলা মালিকে দেখে অভিভূত হয়েছিলো তখনই সরে পড়া উচিৎ ছিলো....

তুমি যা বলছো তা সম্ভব ছিলো না কারণ কান্দাই হত্যা রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গেলে আমাকে আমির আলীর বাড়িতে সদা সর্বদা থাকতে হবে, বাইরে থেকে এ হত্যা রহস্যের কোনো হদিস পাওয়া যেতো না। তুমি বিশ্বাস করো নূরী আমি সেজন্যই বাধ্য হয়ে নীলার সঙ্গে অভিনয় করেছি।

তুমি কি জানতে না এর পরিণতি কি হবে?

জানতাম তবু উপায় ছিলো না।

এখন নীলাকে কি করে বাঁচাবে সেই চিন্তা করো।

নূরী আমি ভেবে পাচ্ছি না কি করবো?

শোন হুর তুমি রংলাল বেশে নীলার সঙ্গে দেখা করো।

কি করে তা সম্ভব?

আমি জানি তুমি যে কোন অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারো।

নূরী তুমি কি চাও আমি নীলার সঙ্গে আবার....

তোমার কাজ এখনও শেষ হয়নি তাই। যখন তোমার কাজ শেষ হবে তখন আমি বলে দিব কি করবে তুমি।

নূরী!

হাঁ বনহুর।

অসাধারণ নারী তুমি। সত্যি মাঝে মাঝে আমি তোমার আচরণে অবাক না হয়ে পারি না। মনিরাও আমার স্ত্রী অথচ তোমাদের দুজনার মধ্যে কত তফাৎ। মনিরা চায় না যে তার স্বামী দ্বিতীয় কোন নারীর সংস্পর্শে আসে। আর তুমি কতদিন নিজের স্বার্থ ত্যাগ করেছো হাসিমুখে।

নূরী বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে বলে—আমি জানি তুমি পবিত্র তুমি নিষ্পাপ। কোন দিন অপবিত্রতা তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তাই তো আমার এতো বিশ্বাস তোমার উপর।

নূরী তোমার সে বিশ্বাস যেন অটুট থাকে।

❑

ভারী বুটের শব্দে মুখ তুলে তাকালো নীলা। সঙ্গে সঙ্গে মুখ খানা ফিরিয়ে নিলো। একটা ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা ভাব তার সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বনহুর।

নীলা আবার বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে।

বনহুর বলে উঠে—মিস নীলা ভাবতে পারিনি আপনি জ্ঞানবতী শিক্ষিতা মেয়ে হয়ে এতো অবুঝ হবেন একটা নগণ্য সাধারণ যুবকের জন্য এভাবে ভেংগে পড়বেন সত্যি আশ্চর্য।

এবার বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে উঠে নীলা—তুমি আমার যে ক্ষতি করেছো তা কোনদিন পূর্ণ হবে না। যাও তোমার কথা আমি শুনতে চাই না। জানি তুমি আমায় বশিভূত করে আমার সর্বনাশ করবে কিন্তু মনে রেখো দস্যু কোনদিন তোমার আশা পূর্ণ হবে না।

অট্টহাসিতে ভেংগে পড়ে বনহুর, তারপর হাসি থামিয়ে বলে মিস নীলা আপনি ভুল বলছেন জানেন এই মুহূর্তে আপনার সব গর্ব খর্ব করতে পারি। দস্যু বনহুরের বাসনা কোনদিন অপূর্ণ থাকে নি। কিন্তু আমি এতো সহজে আপনাকে গ্রহণ করতে চাই না। আরও সময় দিলাম ভেবে দেখুন মুক্তি চান না বন্দিনী থাকতে চান? যদি রংলালের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন তা হলে মুক্তি পাবেন আর যদি রংলালকে চান তাহলে কোনদিন আপনার মুক্তি নাই। আমার বন্দীশালায় চিরদিন আপনাকে বন্দিনী থাকতে হবে।

রংলাল! রংলাল বেঁচে আছে! বলো বলো দস্যু বনহুর রংলাল বেঁচে আছে! নীলা শয্যা ত্যাগ করে ছুটে আসে বনহুরের পাশে।

বনহুর বলে—হাঁ সে জীবিত আছে।

সত্যি। সত্যি বলছো দস্যু বনহুর!

মিথ্যা বলে লাভ নেই কোন তাই মিথ্যে বলবো না। যা বলছি সব সত্যি।

নীলা বনহুরের বুটসহ পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে—তুমি আমাকে রংলালের কাছে নিয়ে চলো।

কিন্তু তা সম্ভব নয়।

কেনো, কোনো সম্ভব নয়!

যদিও রংলাল মরেনি কিন্তু সে বন্দী অবস্থায় আছে।

রংলাল বন্দী!

হ্যাঁ।

তোমার পায়ে পড়ি আমাকে একবার তুমি তার কাছে নিয়ে চলো।

যা বলবো যদি আমার কথামত চলতে পারেন তবে আমি তাকে নিয়ে আসবো আপনার কক্ষে।

যা বলবে তুমি আমি তাই করবো! তবু ওকে একবার আমায় দেখতে দাও।

আজ থেকে নিয়মমত নাওয়া খাওয়া করবেন, যান ঐ যে টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়া খেয়ে নিন।

নীলা এগিয়ে যায় টেবিলের পাশে।

বনহুর একটু হেসে বেরিয়ে যায় কক্ষ থেকে।

ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায় নীলা উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতিক্ষা করতে থাকে। না জানি কখন দস্যু বনহুর তার রংলালকে নিয়ে হাজির হবে। একটা অপূর্ব আনন্দের শিহরণ জাগছে তার হৃদয়ে। আবার পরক্ষণেই মনটা ভরে উঠছে হতাশায় দস্যু বনহুর মিথ্যা বলেনি তো।

একটা শব্দে ফিরে তাকায় নীলা; দেখতে পায় কক্ষের মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে রংলাল। মুহূর্তে তার চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে, ছুটে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে ওর বুকে—রংলাল!

নীলা!

বলো কোথায় ছিলে তুমি?

তোমার সম্মুখেই ছিলাম—মানে আমাকে ওরা বন্দী করে রেখেছিলো এই বন্দীশালায়।

আর আমি তোমায় যেতে দেবোনা মনির। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না।

নীলা এটা দস্যু বনহুরের আস্তানা। এখানে আমরা সবাই তার বন্দী।

আমি দস্যু বনহুরকে বলে তোমায় ভিক্ষা চেয়ে নেবো। তুমি থাকবে আমার পাশে।

নীলা আমাকে মাত্র একটি ঘন্টার জন্য দস্যু বনহুর মুক্তি দিয়েছে। যদি তার বেশি বিলম্ব হয় তাহলে হয়তো আর আমাকে এখানে আসার অনুমতি সে দেবে না।

মনির তুমি বেঁচে আছো সুস্থ আছো এটাই যে আমার সবচেয়ে আনন্দ। দস্যু বনহুরের লোক বলেছিলো তুমি বেঁচে নাই। সত্যি আমি যে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। আত্মহত্যা করবো বলে মনে স্থির করে নিয়েছিলাম।

নীলা এ তুমি কি বলছো?

সত্যি বলছি কিন্তু ওরা আমাকে মরতে দেয়নি। মরলে তোমাকে দেখতে পেতাম না রংলাল।

বনহুর নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

নীলা বনহুরের বুকে মুখ রেখে গভীর আবেগে বলে চলে—জানিনা তুমি কি! জানিনা তুমি কি রংলাল। তোমাকে আমার এতো ভাল লাগে কেনো। আমি জানিনা....

নীলা আজকে বিদায় দাও আবার আসবো।

যাবে তুমি—যাও কিন্তু আবার এসো....তোমার প্রতিক্ষায় প্রহর গুণবো।

বনহুর বেরিয়ে যায়।

নীলা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে ওঁর চলে যাওয়া পথের দিকে।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলো নীলার খেয়াল নেই। দরজা খোলার শব্দ হলো, ফিরে তাকাতেই নজরে পড়লো পূর্বের সেই লোকটা রেকাবীতে অনেকগুলো ফলমূল নিয়ে এগিয়ে আসছে।

আজ নীলার চোখে মুখে উজ্জল আনন্দ ঝরে পড়ছে। সে নিজের হাতে অনুচরটির হাত থেকে ফল মূলের রেকাবী নিয়ে টেবিলে রেখে বলে—তুমি যাও।

অনুচরটি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নীলার মুখের দিকে তারপর বেরিয়ে যায়।

নীলা আপন মনেই বলে—থাক, ফলগুলো থাক আমি রেখে দেবো ওর জন্য। আবার আসবে সে তখন ওকে এই ফলগুলো খেতে দেবো। দস্যু বনহুর ওকেও বন্দী করে রেখেছে নিশ্চয়ই ওর কষ্ট হচ্ছে। হয়তো ঠিকমত খেতে পাচ্ছে না।

আজ নীলা তার ঘরখানার চারদিকে পূর্ণদৃষ্টি নিয়ে তাকালো। এতোদিন সে কোন দিকে প্রাণ ভরে তাকিয়ে দেখিনি। আজ নতুন এক রূপধরা দিলো তার চোখে। আলনায় সাজানো শাড়িগুলোকে সে তুলে নিলো হাতে.খুব সুন্দর শাড়িগুলো।

ড্রেসিং টেবিলে এসে বসলো নীলা—নিজের মুখখানা দেখেনি। এখানে আসার পর সে যত্ন নেয়নি নিজের শরীরের। নীলা স্নানাগারে প্রবেশ করলো। দেহের বসন উন্মোচন করে হাউজের মধ্যে নেমে পড়লো। মনের উজ্জল আনন্দে স্নান সেরে ফিরে এলো কক্ষে।

নতুন শাড়ি পরে নিলো তারপর প্রসাধনি দ্বারা নিজেকে সাজালো সুন্দর করে। আজ বনহুরের এ বন্দীখানাকে তার কাছে স্বর্গ বলে মনে হচ্ছে।

হঠাৎ আয়নায় তার চেহারার পাশে ভেসে উঠলো একটি জমকালো মূর্তি। মুহূর্তে নীলার মুখখানা অন্ধকারময় হয়ে উঠলো। ফিরে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে ধীরে ধীরে। অস্ফুট কণ্ঠে বললো—দস্যু বনহুর তুমি এসেছো?

বনহুর নীলার পা থেকে মাথা অবধি এক নজরে তাকিয়ে দেখে নেয় তারপর হেসে বলে—চমৎকার।

নীলার মুখ ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয়ে উঠে।

বনহুর বলে আবার—আজ যে বড় আনন্দ উজ্জল লাগছে? রংলাল বুঝি আপনার মনের সব ব্যথা বেদনা মুছে নিয়ে গেছে?

নীলা কোনো জবাব দেয় না।

বনহুর বলে—এবার যা কথা দিয়েছিলেন পূর্ণ হোক?

নানা তুমি আমাকে মাফ করো দস্যু বনহুর। তুমি আমাকে মাফ করো।

তা হয় না নীলা। তবে কি কারণে আমি আপনার বাসনা পূর্ণ করবো? আপনি যদি আমার বাসনা পূর্ণ না করেন। যাক আজও আমি আপনাকে রেহাই দিলাম কিন্তু যদি কোন সময় নিজের প্রতি অযত্ন নেন বা ঠিকমত নাওয়া খাওয়া না করেন তবে আবার আসবো—

সেদিন আমি মাফ করবো না।

বনহুর চলে যায় যেমন এসেছিলো তেমনি।

নীলা হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচে।

যতক্ষণ বনহুর তার সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলো ততক্ষণ তার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিলো। একটা দুর্বলতা তাকে অস্থির করে তুলেছিলো কারণ সে নারী দস্যু বনহুর পুরুষ তবু সাধারণ পুরুষ নয় সে অসীম শক্তিশালী এক ভয়ঙ্কর দস্যু।

নীলার মনের এ দুর্বলতা অহেতুক নয় কারণ সে একজন নারী।

নীলার হৃদকম্প শুরু হয়েছিলো ধীরে ধীরে সে স্বাভাবিক হয়ে আসে। ভাবে দস্যু বনহুরের কথা—লোকে যতই তাকে মন্দ অসৎ বলুক ততখানি সে মন্দ বা অসৎ নয়। মনে পড়ে সেই রাতের কথা হামবার্টের সেই জঙ্গল বাড়ি ঘাটি থেকে কি ভাবে যে তাকে এবং তার পিতা আমির আলীকে বাঁচিয়ে নিয়েছিলো। শুধু তাই নয় ঐ মুহূর্তে দস্যু বনহুর যদি গিয়ে না পৌঁছাতো তা হলে হামবার্ট তার সতীত্ব বিনষ্ট করে ফেলতো তাতে কোন

সন্দেহ নাই। মনে প্রাণে নীলা দস্যু বনহুরকে তখন ধন্যবাদ জানিয়েছিলো। কিন্তু প্রকাশ্যে সে কোন কথাই বলেনি। তাছাড়াও দস্যু বনহুর তাকে এবং আব্বুকে এখানে নিয়ে আসার পিছনেও একটা গভীর রহস্য আছে।

দস্যু বনহুর তাকে এখানে নিয়ে আসার পর এমন কোন অসৎ আচরণ করেনি যাতে তার প্রতি একটা ঘৃণা ভাব জন্মাতে পারে। বরং দস্যু বনহুর তার নাওয়া খাওয়া ব্যাপারে বার বার সচেতন রয়েছে। নীলার চিন্তা ধারায় দস্যু বনহুর মহৎ বলে ধরা পড়ে। নীলা আরও ভাবে দুস্য বনহুর তাকে বহুবার একা এবং নির্জনে পেয়েছে ইচ্ছা করলে সে জোর পূর্বক তার বাসনা চরিতার্থ করতে পারতো কিন্তু সে তা করেনি।

নীলা যখন দস্যু বনহুরকে নিয়ে ভাবছে তখন কান্দাই পর্বতমালার তলদেশে গোপন একগুহায় হামবার্ট পায়চারী করে চলেছে। এতো প্রচেষ্টা তার সব ব্যর্থ হয়েছে। জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস করে তবু দস্যু বনহুরকে হত্যা করতে সক্ষম হয়নি। আমির আলীকে সে আটক করে তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো সম্ভব হলোনা। নীলাকে বক্ষে ধারণ করে তার কুমনবৃত্তিপূর্ণ করাও হলোনা। হামবার্ট উন্মাদের মত হয়ে উঠেছে। তার কয়েকজন বলিষ্ঠ অনুচরকেও সে এসব কারণে হত্যা করেছে।

হামবার্টের রাগ আরও চরমে উঠেছে কারণ গো লাইসিং মাথাটা রংলালের বলে কেটে এনেছিলো পরে জানতে পেরেছে আসলে সেটা রংলালের নয়! আমির আলীর ভ্রাতুষ্পুত্র মিঃ হাসিম কায়েসীর মাথা সেটা।

গোংলাইসিং ভয় পেয়ে ঘাটি ত্যাগ করেছে। সে যখন জানতে পেরেছিলো রংলাল নিহত হয়নি নিহত হয়েছে অপর একজন। তখন গোংলাইসিং আত্মগোপন করে সরে পড়েছিলো কারণ সে জানতো হামবার্ট তাকে কিছুতেই ক্ষমা করবেনা।

গোংলাইসিং আত্মগোপন করে চুপ রইলোনা সে উন্মত্ত হয়ে নীলার সন্ধান করে ফিরতে লাগলো। কোনক্রমে যদি সে নীলাকে নিয়ে হামবার্টের নিকটে হাজির করতে পারে তাহলে হয়তো জীবনে সে বেঁচে যেতে পারে।

সমস্ত কান্দাই শহরে সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কখনও মোটর ড্রাইভার। কখনও রিক্সাওয়ালা। কোন সময় ফেরিওয়ালা কখনও সাপুড়ে বা বাদর নাচনেওয়ালা। নাপিত মুচিও হলো সে সুযোগ বুঝে।

একদিন নাপিত বেশে যাচ্ছিল গোংলাইসিং হঠাৎ কজন লোক তাকে ডাক দেয়।

লোকটি অন্য কেহ নয় দস্যু বনহুরের একজন অনুচর। সে গোংলাই সিং এর ছদ্মবেশ ধরতে পারেনি। আমির আলী সাহেবের অনুরোধে সে একটি নাপিত ডেকে এনেছিলো তার চুল কাটবার জন্য।

অনুচর নাপিতটিকে একেবারে আস্তানার ভিতরে নিয়ে না গেলেও তাকে যতটুকু নিয়ে যাওয়া হলো তাতেই সে সব জানতে পারলো।

আমির আলীকে দেখেই তার চোখ দুটো চক চক করে উঠলো। এতোদিন সে যাদের সন্ধান করে ফিরছিলে তাদের সে খুঁজে পেয়েছে। আমির আলীর চুল কাটছিল আর ভাবছিলো নিশ্চয়ই এখানেই কোথাও আছে নীলা।

এক সময় চুল কাটা শেষ করে ফিরে গেলো নাপিত বেশি গোংলাইসিং।

ফিরে গিয়ে অনেক চিন্তা করলো সে কিন্তু কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলোনা। অনেক ভেবে এক সময় হামবার্টের কাছে সব কথা বলাই উচিৎ মনে করলো। কিন্তু হামবার্টের সম্মুখে যাবে সে কেমন করে। প্রথম দর্শনেই তাকে সে হত্যা করে ফেলবে।

হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি এলো, নীলাকে যেমন করে হোক চুরি করে নিয়ে যাবে হামবার্টের সম্মুখে—তারপর সবকথা বলবে।

কিন্তু নীলাকে চুরি করাটাই বড় সমস্যা। আমির আলীকে গোংলাইসিং দেখেছে, নীলাকে সে এখনও দেখেনি তবে সে আন্দাজে ধরে নিয়েছে এই বাড়ির ভিতরেই আছে সে।

গোংলাই তাই হামবার্টের কাছে না গিয়ে সব সময় ঐ গলিটার মধ্যে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

সুচতুর গোংলাই এর মাথায় বুদ্ধি বেশি ছিলো তাই সে কেমন করে নীলাকে পাবে সেই চিন্তা করতে লাগলো। এক সময় তার মাথায় বুদ্ধি এলো যদি ঐ অনুচরটির বেশে ভিতরে প্রবেশ করা যায় তা হলেই বাস কর্ম ফতে।

একদিন দু'দিন্ তিন দিন ঐ দরজার দিকে লক্ষ্য রেখে দূরে একটা ডাষ্টবিনের পাশে বসে বসে ঝিমুতে লাগলো। হঠাৎ একদিন তার সাধনা সিদ্ধ হলো, ঐ অনুচরটিকে সে দেখতে পেলো যে তাকে একদিন ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো আমির আলীর মাথা কামাতে।

গোংলাইসিং ঐ অনুচরটিকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো। অবশ্য গোংলাই এর শরীরে নাপিতের পোশাক রয়েছে।

অনুচরটি এগিয়ে এলো—আমাকে ডাকছো নাপিত ভায়া?

হাঁ ভায়া শোন।

অনুচরটি এগিয়ে এলো।

গোংলাই সিং তাকে ডেকে আর একটু আড়ালে নিয়ে এলো। দস্যু বনহুরের অনুচর হয়েও সে এতো বুদ্ধিহীন হবে ভাবা যায় না। এই অনুচরটি বয়স তেমন বেশি নয়, কম বয়সী ছেলে মানুষ বলেই তার এ ভুল।

গোংলাইসিং ওকে আড়ালে ডেকে বললো—ভাই সিগারেট খাবে? খুব ভাল সিগারেট....পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে বাড়িয়ে ধরলো—ই নাও। সত্যি তুমি আমার ঠিক্ ছোট ভাই-এর মত।

অনুচরটি নাপিতবেশী গোংলাইকে চিনতে পারে না তার মিষ্টি কথায় ভুলে যায় সে। তাছাড়া সিগারেট খেতে দোষ কি সে তো কোন গোপন কথা বলছে না।

অনুচরটি সিগারেটের কয়েক মুখ ধোঁয়া পান করতেই ঢলে পড়ে। এবার গোংলাই তাকে টেনে নিয়ে যায় আড়ালে তারপর ঠিক্ অনুচরটির পোশাক খুলে পরে নেয়। একেবারে সে পাল্টে যায় নিখুঁতভাবে।

বনহুরের অনুচরের বেশে সজ্জিত হয়েও গোংলাই সিং দরজার দিকে এগুতে সাহস পায়না কারণ দরজা কেমন করে খুলতে হয় সে জানেনা।

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো তবু কেউ এলোনা যার সঙ্গে সে প্রবেশ করবে ভিতরে।

বসে বসে জিমুচ্ছে সন্ধ্যার ঝাপসা অন্ধকারে হঠাৎ দরজা খুলে যায়, বেরিয়ে আসে একটা লোক।

এউ সুযোগে এগিয়ে যায় গোংলাই সিং গলার স্বর যতদূর সম্ভব বনহুরের অনুচরটির মত করে বলে—ফিরতে বড্ড দেরী হয়ে গেলো...

যে ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলো সে বললো—হীরু তুই গিয়েছিলি কোথায় বলতো? এদিকে তোকে খুঁজে হয়রান।

গোংলাই বলে—পথে হঠাৎ আমার চাচার সঙ্গে দেখা তাই একটু... গালপাট্টাটা আরও ভাল করে গালে জড়িয়ে বলে—যা শীত পড়ে গেছে।

চল ভিতরে চল্ কত কাজ পড়ে আছে আর তুই ঘুরে বেড়াচ্ছিস।

চলো ভায়া চলো।

গোংলাই অনুচরটির সঙ্গে এগিয়ে চললো।

যতই এগুচ্ছে ততই বিস্ময়ে গংলাই এর দু'চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠছে। অন্ধকার দুর্গন্ধময় পঁচাগলির মধ্যে এমন একটি বিরাট বাড়ি। শুধু বাড়িখানাই বিরাট নয়, নানারকম মূল্যবান জিনিস পত্রে সুন্দরভাবে সাজানো।

যেদিকে তাকাচ্ছে সেদিক থেকে সহসা সে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না। অপরূপ সব দৃশ্য। যা গোংলাই সিং দেখেনি কোনদিন।

এবার গোংলাইকে যেখানে নিয়ে আসা হলো সেটা হলো পাকশাকের ক্যাবিন্। প্রথম অনুচরটি বললো যা হীরু খান বাহাদুর আর তার মেয়ে নীলার ঘরে খাবার দিয়ে আয়।

গোঙলাই সিং যতদূর সম্ভব নিজের মুখখানাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে কাজ করছিলো বললো—আচ্ছা যাচ্ছি।

প্রথম অনুচর বললো—ফরিদ তুই হীরুর সঙ্গে যা। একা ও পারবে না দু'ঘরে খাবার দিতে।

হীরুবেশী গোংলাই এর মুখ এতোক্ষণে প্রসন্ন হলো। না হলে তা খান বাহাদুর এবং তার কন্যা নীলার কক্ষ চেনেনা। কোন কক্ষে কে থাকে জানেনা গোংলাইসিং!

গোংলাইসিং আর ফরিদ মিলেই আমির আলী এবং নীলার খাবার নিয়ে চললো।

গোংলাইসিং কথা খুব কম বলছে, বেশি বলতে গেলে হঠাৎ যদি ধরা পড়ে যায়। যদি ফাঁস হয়ে যায় তার সব অভিসন্দি। অবশ্য গো[illegible]ই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েই এখানে এসেছে। সে জানে যদি সে ধরা পড়ে তাহলে মৃত্যু তার অনিবার্য। একটা যাতা কোন জায়গা নয় স্বয়ং দস্যু বনহুরের বাসস্থান, সেটাও গোংলাই আন্দাজে ঠাওর করে নিয়েছে।

গোংলাই সঠিক জানেনা সে কোথায় এসেছে। তবু সতর্কতার সঙ্গে কাজ করে চলে।

ফরিদ ওকে সঙ্গে করে আমির আলীর কক্ষে খাবার নিয়ে যায় তারপর নীলার কক্ষে।

দরজা খুলে যেতেই গোংলাই এর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠে। নীলাকে দেখতে পেয়ে ক্ষুব্ধ শার্দ্দুলের মত হয়ে উঠে সে। মনোভাব অতি সাবধানে দমন করে খাবার রেকাবী টেবিলে সাজিয়ে রাখে।

বেরিয়ে যাবার সময় ফরিদ কি ভাবে দরজা খুললো এবং কি ভাবে বন্ধ করলো সব সে মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলো।

রাতে শুয়ে শুয়ে গোংলাই চিন্তা করতে লাগলো এই একটি মাত্র রাত এখন তার হাতে আছে। এই রাতে যদি সে কিছু করতে না পারে তাহলে সব ব্যর্থ হবে এমন কি তার জীবনও বিনষ্ট হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। কাল ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাকে চিনে ফেলবে।

রাত দুটো কিংবা তিনটে হবে। গোঙলাই শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো। সে জানে কেউ জাগবেনা কারণ সে এক সময় অতি সতর্কতার সঙ্গে খাবার পানিতে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলো। সে ছাড়া সবাই পানি পান করেছে। কারো মনে কোন সন্দেহের ছায়া পড়েনি পড়ার কোন কারণ ও ছিলো না।

গোংলাই দিব্য আরামে কক্ষ থেকে বেরিয়ে সোজা সে চলে যায় নীলার কক্ষে। যে ভাবে দরজা খুলেছিলো ফরিদ সেই ভাবে দরজা খুলে ফেলে এবং সে ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পায় নীলা তার বিছানায় অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ডিম লাইটের স্বল্প আলোতে নীলার অপরূপ সৌন্দর্যে ভরা দেহখানা ঠিক একটি ছবির মতই মনে হচ্ছিলো।

গোঙলাই কিছুক্ষণ নির্নমেষ নয়নে নীলার অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করে চললো। হঠাৎ মনে পড়লো নীলা যদি এই মুহূর্তে জেগে উঠে তাহলে সে চিৎকার করবে বা একটা অনর্থ সৃষ্টি করবে। পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে নীলার ঘুমন্ত মুখের কাছে ধরলো।

নীলা মাথাটা একটু নাড়ালো একবার তারপর স্থির হয়ে গেলো তার দেহটা। গোংলাইসিং এবার নীলার সংজ্ঞাহীন দেহটা তুলে নিলো কাঁধে।

পরবর্তী বই
জিহাংহায় দস্যু বনহুর

জিহাংহায় দস্যু বনহুর-৬৬

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

নীলাকে কাঁধে নিয়ে এগিয়ে চললো গোংলাইসিং সামনের দিকে। এখানে প্রবেশের সময় পথ সে ভালভাবে চিনে রেখেছিলো, তাই কোন অসুবিধা হয় না বেরিয়ে আসতে।

নীলা চোখ মেলে তাকাতেই ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে। মৃতের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠে তার মুখমণ্ডল। দেখতে পায় সেই মুখ, সেই ভয়ঙ্কর দু'টি চোখ, লোলুপ কুৎসিত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। নীলাকে চোখ মেলতে দেখেই হামবার্ট বলে উঠে—এবার সুন্দরী, কে তোমাকে রক্ষা করবে? কোথায় তোমার অহঙ্কারী পিতা, কোথায় তোমার রংলাল আর কোথায় তোমার হিতাকাঙ্খী দস্যু বনহুর? অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে শয়তানটা।

নীলার সংজ্ঞা ফিরে এসেছে, সে ভাবছে, এসব কি স্বপ্ন দেখছে! সে তো খেয়ে দেয়ে দিব্য আরামে তার বিছানায় ঘুমিয়েছিলো। এখন সে কোথায়? তবে কি দস্যু বনহুরের আস্তানা এটা নয়? আর দস্যু বনহুরের আস্তানাই যদি হবে এটা তাহলে নরপিশাচ হামবার্ট কি করে এখানে আসবে। বিস্ময় নিয়ে নীলা উঠে বসে বিছানায়, অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে চারদিকে।

হামবার্ট বুঝতে পারে নীলার মনে প্রশ্ন জাগছে সে কি করে এখানে এলো। তাই হামবার্ট বললো—মিস নীলা আমি বলেছিলাম যেমন করে হোক তোমাকে চাই। দেখলে আমার কথা সত্যি হলো কিনা। মনে রেখো, হামবার্ট যা বলে তা সে করে । যাদুমন্ত্রের দ্বারা আমি তোমাকে এই কান্দাই পর্বতের তলদেশে নিয়ে এসেছি।

এবার নীলা বুঝতে পারে সে এখন কোথায়। কান্দাই পর্বতমালার তলদেশে হামবার্টের কোন গোপন ঘাটিতে। শিউরে উঠে সে কারণ এবার তার রক্ষার কোনো উপায় নাই। কিন্তু হামবার্ট বলছে তাকে যাদু মন্ত্রের দ্বারা এখানে এনেছে। এটা কি সত্য না মিথ্যা।

নীলার সরল মনে নানা প্রশ্ন উঁকি দেয় কিন্তু এসব বেশীক্ষণ ভাববার সময় পায় না। হামবার্ট দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসে। দু'চোখে তার

লালসা আর ক্ষুধার্ত শৃগালের দৃষ্টি। ভয়ঙ্কর একটা হিংস্র জীবের মত লাগছে তাকে। ক্রমে নীলার দিকে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে সে।

নীলা উঠে বসেছে, তাকাচ্ছে সে চারদিকে অসহায় চোখে।

হামবার্ট যত এগুচ্ছে নীলা ততই পিছিয়ে যাচ্ছে।

ওপাশের দেয়ালে দপদপ করে একটা মশাল জ্বলছে, মশালের আলোতে হামবার্টের চোখ দুটো আগুনের গোলার মত লাগছে যেন। নীলার কণ্ঠ নালী শুকিয়ে গেছে। অসহ্য একটা যন্ত্রণা তার বুকের মধ্যে ঝড় তুলেছে। সমস্ত পৃথিবীটা তার চোখের সামনে দুলছে। নীলা ভীতভাবে চিৎকার করে উঠে— না না আমাকে তুমি স্পর্শ করোনা। না না না....

হামবার্ট হেসে উঠে তারপর হাসি থামিয়ে বলে—আজ আমি কোন কথা শুনবোনা। বহুদিন ধরে আমি তোমার প্রতিক্ষা করে আসছি, আজ তোমায় পেয়েছি। এমন কোন শক্তি নাই যে তোমাকে আজ আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। নীলা তুমি আমার হৃদয়ের রাণী মেরী পিয়ারী এসো, এসো আমার বুকে এসো।

হামবার্ট ধরে ফেলে নীলাকে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে দস্যু বনহুর এসে দাঁড়ায়, ঠিক যেন মাটি ভেদ করে সে আবির্ভূত হলো। দাঁতে দাঁত পিষে কঠিন কণ্ঠে বললো হামবার্ট!

কে, দস্যু বনহুর তুমি!

হাঁ।

হামবার্ট নীলাকে মুক্ত করে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

দস্যু বনহুরের হাতে আজ মেশিনগান।

হামবার্টের চোখ দুটো প্রথমে বিস্ময়ে গোলাকার হয় তার পরে ক্রোধে ফেটে পড়ে যেন, বলে উঠে হামবার্ট—এই দুর্গম স্থানে তুমি কি করে এলে দস্যু?

যাদুমন্ত্রের দ্বারা তুমি যেমন নীলাকে এখানে নিয়ে এসেছো তেমন করেই আমি এখানে এসেছি। খবরদার একটু নড়লেই আমি ব্রাস ফায়ার করে তোমার দেহটাকে ঝাঁজরা করে দেবো।

হামবার্ট একটু পূর্বে তার দেহ থেকে রক্ষাবর্ম খুলে এই গুহায় প্রবেশ করেছিলো। রক্ষাবর্ম পরা থাকলে তার দেহে কোন আঘাত বা গুলি বিদ্ধ হয় না। হামবার্ট মনে করেছিলো এবার সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। গোংলাইসিং যখন নীলাকে এনে তার সম্মুখে হাজির করলো, তখন সে পারেনি গোংলাইকে

হত্যা করতে। নীলার সংজ্ঞাহীন দেহটা তার ক্ষুধিত মনে পাপ বাসনা জাগিয়ে তুলেছিলো। লালসায় সে অন্ধ হয়ে পড়েছিলো। হামবার্ট নীলার জন্য গোংলাইসিংকে খুলে দিয়েছিলো তার আংগুলের হীরক অংগুরী।

এই মুহূর্তে হামবার্ট শুধু বিস্মিতই হয়নি সে হতবাক হয়ে পড়েছে। এই অজানা দুর্গম স্থানে দস্যু বনহুর এলো কি করে, লোক চক্ষুর অন্তরালে, পর্বতমালার তলদেশে সে নিশ্চিত মনে তার প্রসার প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিলো।

হামবার্ট হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েলো যেন, সে চিৎকার করে বললো—গোংলাইসিং একে পিছন থেকে বন্দী করে ফেলো।

হামবার্ট ভেবেছিলো বনহুর ফিরে তাকাবে পিছনে সে ঐ দণ্ডে আক্রমণ করবে তাকে পিছন থেকে কিন্তু বনহুর কঠিন কণ্ঠে বললো—গোংলাইসিং আর আসবেনা হামবার্ট। সে চির নিদ্রায় অচেতন।

হামবার্ট করতালি দিয়ে ডাকে—হার্ম হিসং রাজ...ফিরু...

বনহুর এবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বললো—কেউ ওরা আসবেনা শয়তান। সবাইকে আমি ঘুমিয়ে রেখে তোমার গুহায় প্রবেশ করেছি।

দস্যু বনহুর!

হাঁ হামবার্ট, তুমি এখন কান্দাই পর্বতমালার পাদদেশে শুধু একা, তোমার দলের একটি প্রাণীও জীবিত নাই।

হামবার্টের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো।

দস্যু বনহুর বললো—অবাক হচ্ছো শুনে তাই না? শোন হামবার্ট, তোমার সব প্রচেষ্টা সব সাধনা ব্যর্থ করে দিয়েছি প্রথম বার তুমি নিজে ধ্বংস করেছো তোমার জঙ্গল বাড়ি ঘাটি। দ্বিতীয় বার সব ধ্বংস করেছি আমি।

তুমি আমার সবকিছু বিনষ্ট করেছো?

হাঁ। আর একটু পরেই তুমি সব টের পেয়ে যাবে। তোমার রক্ত এবং চক্ষু রক্ষাগার আর তোমার হৃদপিণ্ড অপারেশন থিয়েটার সব ভষ্মিভূত হচ্ছে। একটু পরেই সেই অগ্নি কাণ্ডের লেলিহান শিখা এখানেও এসে পড়বে।

হামবার্ট শুষ্ক কণ্ঠে বলে উঠে—তুমি আগুন জ্বেলে দিয়েছো?

হাঁ, তোমাকেও আমি সেই আগুনে পুড়িয়ে মারবো হামবার্ট।

নীলা বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখছিলো একবার দস্যু বনহুরের কালো আবরণে ঢাকা চোখ দুটোর দিকে একবার হামবার্টের ভয়ার্ত কুৎসিত

কদাকার ভয়ঙ্কর মুখখানার দিকে। এই মুহূর্তে নীলার কাছে দুস্য বনহুরকে অতি আপনজন বলে মনে হচ্ছে তার। তবুও সে পারছে না ওর পাশে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াতে।

হামবার্টের ঠিক সম্মুখে দাঁড়িয়ে দস্যু বনহুর। তার হাতে মেশিনগান। মেশিনগানের মুখটা হামবার্টের বুক লক্ষ্য করে ধরে আছে। যে কোন মুহূর্তে মেশিনগানের গুলি তার দেহকে ঝাঁজরা করে ফেলতে পারে।

হঠাৎ হামবার্ট তীর বেগে নীলাকে টেনে নেয় কাছে।

এতো দ্রত হামবার্ট নীলাকে টেনে নেয় যা দৃষ্টির পলকে হয়ে যায়। বনহুর মেশিনগান চালাতে পারেনা।

হামবার্ট নীলাকে সম্মুখে রেখে পিছু হটতে থাকে। মাত্র এক সেকেণ্ড, নীলাসহ হামবার্ট ঠিক দেয়ালের পাশে গিয়ে থেমে পড়ে।

বনহুর মেশিনগান সহ ঝাঁপিয়ে পড়ে হামবার্ট-এর উপর। কিন্তু বনহুরের ধাক্কায় নীলা পড়ে যায় মেঝেতে, হামবার্ট যেন হাওয়ায় মিশে গেছে।

নীলাকে যদি হামবার্ট হঠাৎ এ ভাবে টেনে না নিতো তাহলে বনহুরের হাত থেকে সে আজ পরিত্রাণ পেতো না কোন মতেই।

নীলাকে হাত ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়।

নীলা কিংকর্তব্যবিমূঢ় য়ে পড়েছিলো, সে এখন কি করবে যেন ভেবে পায় না।

বনহুর বলে— মিস্ নীলা, আপনি আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না কারণ হামবার্টের গোপন ঘাটিতে আমি আগুন ধরিয়ে দিয়েছি। আর অল্প সময়ে সম্পূর্ণ ঘাটিতে আগুন ছড়িয়ে পড়বে।

নীলা বলে উঠে— কি করবো বলো দস্যু বনহুর? এখন আমি কি করবো?

আমার সঙ্গে আসুন। শয়তান হামবার্ট পালিয়েছে। এসে পুনরায় আক্রমণ চালাতে পারে। কাজেই আপনাকে যতক্ষণ নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম না হয়েছি ততক্ষণ আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন রয়েছি। আসুন আমার সঙ্গে।

নীলাকে সঙ্গে নিয়ে বনহুর বেরিয়ে আসে সেই স্থান থেকে একটি সুড়ঙ্গ পথে দ্রুত তারা এগিয়ে চলে।

বনহুর কিছুটা অগ্রসর হয়ে একটি গুহামধ্যে প্রবেশ করে।

নীলা বিস্ময় নিয়ে দেখে সেই গুহামধ্যে কতগুলো অর্দ্ধ উলঙ্গ নারী জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। সমস্ত গুহামধ্যে ধুম্ররাশি ছড়িয়ে পড়েছে। অল্পক্ষণেই এই অগ্নিকাণ্ড এই গুহা মধ্যেও এসে পড়বে।

নীলার মুখমণ্ডল লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠলো।

বনহুর ওদিক এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় সুইচে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে একটি দরজা বেরিয়ে এলো। বনহুর বললো— বোন, আপনারা এই পথে দ্রুত এগিয়ে যান, যেখানে সুড়ঙ্গমুখ শেষ হয়েছে সেখানে পৌঁছতে পারলেই আপনাদের মুক্তি, যান একদণ্ড বিলম্ব করবেন না।

যুবতীগণ তখন ভাব্‌বার সময় পেলো না, তারা দিশেহারার মত ছুটলো সেই সুড়ঙ্গ পথে।

বনহুর এবার নীলাসহ অপর একটি সুড়ঙ্গ পথে এগিয়ে চললো। সমস্ত পথ ধুম্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে দস্যু বনহুর আর নীলা। যদিও নীলার মনে একটা আতঙ্ক ভাব দানা বেঁধে উঠেছে, দস্যু বনহুর তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, তার প্রতি সে কিইবা আচরণ করবে কে জানে। এর চেয়ে তার মত্যু হলেও ভাল ছিলো। সেবার পিতা ছিলো বলে একটা সাহস ছিলো তার মনে, এবার সে একা নিঃসহায় নিঃসঙ্গ।

মন দুরু-দুরু করছে কিন্তু না গিয়ে কোন উপায় নাই। এই ভয়ঙ্কর দূর্গম স্থানে একমাত্র দস্যু বনহুরই যেন তার সহায়। তবু নীলা মনে প্রাণে খোদাকে স্মরণ করতে থাকে।

কিছুটা এগুতেই আর একটি গুহা দেখতে পেলো নীলা।

বনহুর সেই গুহায় প্রবেশ করলো।

নীলাও এলো তার পিছু পিছু।

এবার নীলার দু'চোখ গোলাকার হয়ে উঠলো, এ গুহায় দেখতে পেলো অনেকগুলো যুবককে দু'হাতে শিকল ঝুলিয়ে দেয়ালে আটকে রাখা হয়েছে। লোকগুলোর মধ্যে কেউ কেউ কঙ্কাল সার হয়ে পড়েছে।

বনহুর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খুলে দিতে লাগলো তাদের হাতের এবং পায়ের লৌহ শিকলগুলো।

নীলার চোখেমুখে বিস্ময়। দস্যু বনহুরের দেহে এতো শক্তি, যেন সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। একা কুঠার জাতীয় জিনিসের আঘাতে শিকলের মুখ দু'খণ্ড করার পর সে নিজের হাতে টেনে খুলে ফেলতে লাগলো একটির পর একটি করে। অল্পক্ষণেই সকলে শিকল থেকে

মুক্ত হয়ে গেলো। বনহুর সবাইকে লক্ষ্য করে বললো—আপনারা যতশীঘ্র পারেন পালান। ঐ পথ দিয়ে দ্রুত ছুটতে থাকুন। আর অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত গুহা গুলোতে আগুন ছড়িয়ে পড়বে। যান, শীঘ্র যান।

বন্দী যুবকগণ বনহুরকে দেখে যেমন অবাক হয়েছিলো তেমনি হতবাক হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাদের ভাববার সময় নেই, সবাই দিশেহারার মত ছুটতে লাগলো।

বনহুর এবার নীলাকে বললো—আসুন আমার সঙ্গে।

ঐ মুহূর্তে সমস্ত গুহায় আগুন ছড়িয়ে পড়েছে।

বনহুর নীলার হাত ধরে সামনের দিকে ছুটতে লাগলো হঠাৎ পথ রোধ করে দাঁড়ালো হামবার্ট। অজস্র ধূম্ররাশির মধ্যে গরিলা দৈত্যের মত মনে হচ্ছিলো হামবার্টকে। দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বের হচ্ছে। ওর হাত দু'খানায় দুটো রিভলভার।

বনহুর সঙ্গে সঙ্গে নীলাকে পিছন দিকে সরিয়ে সে সম্মুখে দাঁড়ায়, ভেবে নেয় সে কি করবে।

হামবার্ট গর্জন করে উঠে—এবার কোথায় পালাবে দস্যু! তোমার পথ বন্ধ। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

বনহুরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে হামবার্ট।

হামবার্টের গুলি তার রিভলভার থেকে বের হবার পূর্বেই বনহুর নীলাকে টেনে নিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে সরে দাঁড়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে হামবার্টের উপর।

হামবার্ট টালসামলাতে না পেরে পড়ে যায় হুমড়ি খেয়ে। হামবার্টের রিভলভার থেকে আরও দুটি গুলি বেরিয়ে যায়। চলে দস্তা ধস্তি ভীষণভাবে।

বনহুর দু'হাতে হামবার্টের রিভলভারসহ হাত দু'খানা চেপে ধরে, যাতে সে পুনরায় গুলি ছুড়তে না পারে। প্রচণ্ডভাবে লড়াই শুরু হয়।

নীলা অবাক চোখে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিলো। ভয়ে দুঃর্ভাবনায় সে এতোটুকু হয়ে গেছে। ছোট বেলায় নীলার কিংকং বই-এর মধ্যে পড়েছিলো— কিংকং আর অদ্ভুত ভয়ঙ্কর একটা জীব তার পুতুল কন্যার জন্য যেমন যুদ্ধ করেছিলো, ঠিক দস্যু বনহুর আর হামবার্ট তাকে নিয়ে সেইভাবে যুদ্ধ করে চলেছে। কে পরাজিত হবে আর কে জিতবে কে জানে।

ততক্ষণে চারিদিকে লেলিহান অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে।

নীলা ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেছে। কাউকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার কাছে দস্যু বনহুর যেমন তেমনি হামবার্ট। তবে দস্যু বনহুরকে সে কিছুটা বিশ্বাস করতে পারে কারণ সে কোন সময় তার উপর জোরপূর্বক কোন অনাচার বা অত্যাচার করেনি।

নীলা এখানে দস্যু বনহুরেরই জয় কামনা করছিলো।

বনহুর যখন হামবার্টের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো তখন সে মেশিনগান ফেলে দিয়েছিলো হাত থেকে কারণ বনহুর বুঝতে পেরেছিলো হামবার্ট তার পোশাকের নিচে রক্ষাবর্ম পরে এসেছে। বনহুরের মেশিনগানের গুলি তার শরীরে বিদ্ধ হবে না। তাই সে দৈহিক শক্তির দ্বারা এই নর-শয়তানকে কাবু করতে মনস্থ করেই আকমণ চালিয়েছে।

বনহুর একসময় হামবার্টের দক্ষিণ হস্তের রিভলভার খানা ছুড়ে ফেলে দিতে সক্ষম হয়। পা দিয়ে চেপে ধরে বাম হাতখানা। তখনও হামবার্টের বাম হাতে রিভলভারখানা রয়েছে।

হামবার্ট প্রাণপণে চেষ্টা করছে নিজকে দস্যু বনহুরের কবল থেকে রক্ষা করে নেবে। কিন্তু দস্যু বনহুরের সংগে পেরে উঠা কম কথা নয়।

এক সময় হামবার্টের বাম হাত থেকেও রিভলভারখানা খসে পড়লো।

বনহুর প্রচণ্ডভাবে দু'হাতে চেপে ধরলো হামবার্টের গলা। হামবার্টের চোখ দুটো যেন ফেটে বেরিয়ে আসছে, সে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে শেষ চেষ্টা করলো নিজকে বাঁচিয়ে নেবার। দু'হাতে সে বনহুরের পাগড়ির অংশসহ জামার আস্তিন চেপে ধরলো। সংগে সংগে খসে পড়লো বনহুরের মাথা থেকে তার পাগড়িখানা।

নীলা বিস্ময়ভরা অস্ফুট শব্দ করে উঠলো— রংলাল রংলাল তুমি

বনহুর মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ঠিক সেই ক্ষণে হামবার্ট বনহুরের হাত থেকে নিজকে বাঁচিয়ে নিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়।

নীলা ঝাঁপিয়ে পড়ে বনহুরের বুকে রংলাল তুমি! মনির তুমিই দস্যু বনহুর?

কপালের এক জায়গা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো। বনহুর হাতের পিঠে কপালের রক্ত মুছতে মুছতে বলে— হাঁ। হাঁ নীলা।

সত্যি আমার কি আনন্দ হচ্ছে মনির...

নীলা এক সেকেণ্ড এখানে বিলম্ব করা উচিৎ নয়। চারিদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে তাছাড়া শয়তান হামবার্ট জীবন নিয়ে উধাও হয়েছে, এক্ষুণি পুনরায় সে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারে।

আমি বিশ্বাস করতে পারছি না তুমিই দস্যু বনহুর। কি যে খুশি লাগছে আমার.....

এসো নীলা সব পরে হবে।

বনহুর নীলার হাত ধরে ছুটতে থাকে।

চারিদিকে ধুম্ররাশি ছড়িয়ে পড়েছে। নীলাকে ধরে সাবধানে ছুটছে বনহুর।

কতবার পড়তে পড়তে বেঁচে যাচ্ছে নীলা।

এতো বিপদেও নীলার মনে অফুরন্ত আনন্দ উচ্ছ্বাস, ওর মনে হচ্ছে যুগ যুগ এমনি বনহুরের হাতে হাত রেখে সে যদি চলতে পারে তাতেও সে কোনদিন ক্লান্ত হবে না।

বনহুর বললো— নীলা আরও কিছুক্ষণ হবে। খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার.....

না কোন কষ্ট হচ্ছে না... তোমার পাওয়ার আনন্দে আমার সব কষ্ট দূর হয়ে গেছে মনির....

দু'জনেই ছুটছে।

ধুম্ররাশিতে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে তাদের। চোখের সামনে জমাট অন্ধকার। তবু সামনের দিকে ছুটছে তারা।

এক সময় এক ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ ধুম্ররাশির মধ্যে ছুটছিলো তারা তাই চোখমুখ ধোঁয়ায় ঝাপসা হয়ে পড়েছিলো। এখানে মুক্ত বাতাসে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিলো বনহুর আর নীলা।

নীলা সচ্ছ দৃষ্টি মেলে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। হৃদয় ভরে সে দেখতে লাগলো ওর পৌরুষদীপ্ত মুখখানা।

নীলা বলে উঠলো— আমি তো স্বপ্ন দেখছিনা। সত্যি রংলাল তুমি, তুমিই দস্যু বনহুর।

রুমালে মুখ মুছে নিয়ে বলে বনহুর— যদি বিশ্বাস না কর তবে মিথ্যা....

হঠাৎ ঐ মুহূর্তে দূরে—অনেক দূরে পর্বতমালার পাদদেশে একটা অদ্ভুত মোটর গাড়ির মত কিছু নজরে পড়ে বনহুর আর নীলার। গাড়িখানা শব্দ বিহীন বলেই মনে হচ্ছে কারণ গাড়িখানা তখন দ্রুত চলছিলো তবু কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিলো না। গাড়ির সম্মুখভাগ ঠিক এরোপ্লেনের মত দেখতে।

নীলা বললো— আশ্চর্য এখানে গাড়ি এলো কি করে ভেবে পাচ্ছিনা?

বললো বনহুর— নিশ্চয়ই হামবার্টের বাহন ওটা।

গাড়িখানা চলতে চলতে হঠাৎ তার দু'পাশে দুটো পাখা বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়ে উঠে গাড়িখানা।

বনহুর আর নীলা তাকিয়ে দেখছিলো।

বনহুর বললো— হামবার্ট কান্দাই ছেড়ে পালিয়ে গেলো। নীলা আপাততঃ তোমরা পিতা পুত্রী নিশ্চিন্ত হলে।

অদ্ভুত গাড়িখানা তখন আকাশের উপরে অনেক দূর উঠে গেছে। ক্রমে মেঘের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যায়। বনহুর বলে নীলা চলো এবার তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

তোমার বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে তাই না?

ক্ষুধার চেয়ে পিপাসা বেশি কিন্তু এখানে কোথায় পাবে তুমি পানি, মনির?

বনহুর চারিদিকে তীক্ষ্ম নজরে তাকায়।

পূর্ব দিক ফর্সা হয়ে এসেছে অল্পক্ষণের মধ্যেই সূর্য উদয় হবে।

বনহুর বললো— নীলা এখানে বসো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর; বেলা উঠলে পানি পাওয়া যাবে কিনা বলতে পারবো।

নীলা ও বনহুর পাশাপাশি বসে পড়ে।

নীলা বলে— সত্যি আমার এতো খুশি লাগছে তোমাকে কি বলবো!

নীলা!

আচ্ছা এবার বলো তো তুমি হঠাৎ কেমন করে এই দুর্গম স্থানে আবির্ভূত হলে?

একটু হেসে বলে বনহুর— যাদু মন্ত্রের ফলে---

মিথ্যা কথা সত্যি করে বলো?

নীলা সবই খোদার ইচ্ছা। তুমি বিশ্বাস করো তাঁর ইচ্ছাতেই আমি তোমাকে নরপশু শয়তান হামবার্টের কবল থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি।

মনির তুমি যদি ঐ মুহূর্তে না এসে পৌঁছতেই তা হলে পাপিষ্ঠ আমার --
--নীলা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে।

বনহুর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে— নীলা কেদো না!কি করে এখানে এলাম তোমাকে সব বলছি। একটু থেমে আবার বলতে শুরু করে বনহুর— শয়তান হামবার্টের অনুচরটি যখন তোমার ঘরে প্রবেশ করলো। তখন ওকে দেখতে পাই। প্রথমে আমি বুঝতে পরিনি, মনে করি সে আমাদেরই

লোক কোন কারণে তোমার কক্ষে যাচ্ছে মনে কেমন সন্দেহ জাগলো। আমি লোকটাকে অনুসরণ করলাম।

নীলা অবাক হয়ে শুনতে লাগলো বনহুরের কথাগুলো।

বনহুর বলে চলেছে— আমি লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলাম সে আমাদের লোক নয় আরও বুঝতে পারি শয়তান আমার কোন এক অনুচররের বেশে আমার আস্তানায় প্রবেশ করেছে।

নীলা বলে উঠে—তুমি তাকে চিনতে পেরেও কিছু বললো না।

তখন আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি।

তারপর ?

লোকটা কি করে আমি সব দেখতে লাগলাম। দেখলাম সে তোমার বিছানার পাশে এসে পকেট থেকে একটি রুমাল বের হরে তোমার নাকের কাছে ধরলো।

মনির তবু তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেনি।

না, কারণ আমি দেখতে চাই এর শেষ কোথায়? ইচ্ছা করলে ঐ দণ্ডে আমি বিড়ালের মত গলা টিপে হত্যা করতে পারতাম কিন্তু করলাম না। আমার উদ্দেশ্য তাকে অনুসরণ করা। দেখতে চাই সে তোমাকে কোথায় নিয়ে যায়।

শুষ্ক কণ্ঠে বলে নীলা—তারপর?

লোকটা যখন তোমার নাকের কাছে রুমাল নাড়ছিলো তখন তুমি একটু নড়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লে। আমি বুঝতে পারলাম তুমি সংজ্ঞা হারালে।

কি সাংঘাতিক ব্যাপার।

হাঁ নীলা সাংঘাতিকই বটে।

তারপর?

তারপর লোকটা এদিক ওদিকে তাকিয়ে দেখে নিলো। যদিও সে জানে কেউ তাকে বাধা দিতে আসবেনা। কারণ লোকটা আমার অনুচরের বেশে আমার আস্তানায় প্রবেশ করে আমার অনুচরের খাবার পানির সঙ্গে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দিয়েছিলো, বুঝতেই পারছে সে কেউ এখন জেগে নেই।

তুমি তাহলে সব জানতে।

হাঁ আমি অনুমানেই বুঝে নিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই আস্তানায় কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে গেছে, না হলে এভাবে সবাই নিদ্রায় অচেতন থাকতো না অন্ততঃপক্ষে প্রহরীগণ সমস্ত রাত জেগে থাকতো। আমি আড়াল থেকে

দেখলাম লোকটা তোমার সংজ্ঞাহীন দেহটা তুলে নিলো কাঁধে। আমি সেই ক্ষণে বেরিয়ে এলাম দ্রুত গতিতে একটা গাড়ি নিয়ে গলির মুখে অপেক্ষা করতে লাগলাম। জানতাম সে তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে আসবে।

অবাক হয়ে গেছে নীলা, দু'চোখ তার কপালে উঠেছে যেন, রংলাল নিজে তাকে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

বনহুর নীলার মনোভাব বুঝতে পারে একটু হেসে বলে— অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটা তোমাকে কাঁধে নিয়ে আমার গাড়ি খানার পাশে দাড়ালো। আমি যেন বসে বসে ঝিমুচ্ছি এমনি ভাব দেখালাম।

তারপর?

লোকটা আমাকে বললো— এই ড্রাইভার ভাঁড়ায় যাবে? আমি হাই তুলে তাকালাম। লোকটা বললো, আমার স্ত্রী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছে... আমি ওকে বেশি বলবার সময় না দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলাম। লোকটা তোমাকে পিছন আসনে শুইয়ে দিয়ে নিয়ে উঠে বসলো, তারপর পথের নির্দেশ দিলো। আমি নির্দেশ মত গাড়ি চালিয়ে চললাম।

সত্যি তুমি এতো নির্দয় হতে পারলে?

নীলা প্রয়োজনে আমাকে এসব করতে হয়েছে। তুমি সব শুনলে বুঝতে পারবে। আর তখন আমাকে নির্দয় বলতে পারবে না। লোকটা আমাকে কোন রকম সন্দেহ না করে এজন্য আমি যথেষ্ট সাবধান তা অবলম্বন করলাম। আমার গাড়ি চলেছে। শহরের পথ ছেড়ে গ্রাম্য পথ তারপর সম্পূর্ণ এলো পাথারী পাহাড়িয়া পথ। অবশ্য মাঝে মাঝে আমি আপত্তি জানাচ্ছিলাম, সাহেব এসব পথে গাড়ি চালাতে পারবো না। লোকটা আমাকে মোটা বখশীসের লোভ দেখালো। আমিও রাজি হয়ে গেলাম। বহুক্ষণ চলার পর এক জায়গায় এসে গাড়ি রাখলাম, সে জায়গা বেশি দূরে নয় --- বনহুর আংগুল দিয়ে অদূরে একটা জায়গা দেখালো ঐ— ওখানে আমার গাড়ি অপেক্ষা করছে। লোকটা তোমাকে গাড়ি থেকে তুলে নিলো কাঁধে।

তোমার বখশীস?

হাঁ তোমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে পকেট থেকে এক গাদা নোট বের করে আমার হাতে দিলো। আমি তো টাকা পেয়ে আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠলাম। লোকটা তখন তোমাকে পেয়ে এতো বেশি খুশি হয়ে পড়েছে যে আর আমার দিকে লক্ষ্য করার সময় পেলো না। তোমাকে নিয়ে সে সোজা এই

পথ ধরে পর্বতের ভিতরে প্রবেশ করলো। আমিও গাড়িখানাকে ঝোঁপের আড়ালে রেখে তাকে অনুসরণ করলাম। সে একটিবার ফিরে তাকিয়ে দেখলো না। আমি শব্দ বিহীন ভাবে রিভলভার সঙ্গে নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে এগুচ্ছি। ইচ্ছা করলে তোমার বাহককে খতম করে তোমাকে অনেক পূর্বেই উদ্ধার করে নিতে পারতাম কিন্তু বুঝতেই পারছো আমার উদ্দেশ্য তোমাকে টোপ ফেলে শিকারকে পাকড়াও করা। হাঁ আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, হামবার্টের সমস্ত অনুচরকে আমি এক এক হত্যা করেছি। তার সমস্ত ঘাটি অগ্নি কুণ্ডে পরিণত করেছি। তোমাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু একটা অনুতাপ হামবার্টকে হত্যা করতে পারলাম।

আশ্চর্য তোমার বুদ্ধিবল, আশ্চর্য তোমার কার্যকলাপ, আশ্চর্য তুমি মানুষ.....

তুমি যাই বলো তাই নীলা। এবার চলো দেখি কোথাও পানি পাই কিনা। তারপর রওয়ানা দেবো আমরা।

নীলা উঠে দাঁড়ালো।

ততক্ষণে চারিদিকে সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে।

খান বাহাদুর আমির আলী ও নীলাকে তাদের বাসভবনে পৌঁছে দেয় বনহুর নিজে। আমির আলীর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠে। তিনি মনে মনে তার কু'কর্মের জন্য লজ্জিত হন। শুধু লজ্জিতই হন না তিনি অনুতপ্তও হন। তিনি তার গবেষণাগার বিনষ্ট করে ফেলেন এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন শুরু করেন। কিন্তু সমস্যা হলো নীলাকে নিয়ে। নীলা তো তার রংলালকে ছাড়া কিছুই বোঝেনা। যাকে নিয়ে নীলার মনে বিপুল আলোড়ন, সে তখন অনেক দূরে।

জিংহায় একটি ছোট্ট হোটেলে নির্জন কক্ষে বসে সিগারেট পান করে চলেছে। কিছুক্ষণ পূর্বে সে এই হোটেলে এসে উঠেছে।

জিংহায় সব চেয়ে ছোট এবং নিকৃষ্ট হোটেল পিউলপাং কুলি, মজুর আর গরিব জনগণই এই হোটেলের বাসিন্দা। বনহুর এখানে একজন শ্রমিকের বেশেই এসে উঠেছে। এ শহরটা চীন রাজ্যেরই একটি অংশ। জনবহুল শহর একেবারে ছবির মত না হলেও মনোরম বটে। প্রশস্ত রাস্তার দু'পাশে সাদা চূন কাম করা গগণ চুম্বি দালান কোঠা। আকাশ সহজে নজরে পড়ে না.

তবে ভালভাবে তাকালে ইলেকট্রিক তরের বেড়া জাল ভেদ করে দেখা যায় নীল আকাশের কিছু অংশ। রাতের বেলায় তাও দেখা যায় না, রাস্তার দু'পাশের দোকানগুলোর অটোমেটিক আলোর ঝলকানি আর ধাবমান গাড়িগুলোর হেড লাইটের তীব্র আলো দুচোখে ধাধা লাগিয়ে দেয়।

হোটেল পিউলপাং শহরের সর্বনিম্ন অঞ্চলেই অবস্থিত। এদিকে সুউচ্চ সাদা সাদা দালান কোঠাগুলোর সারি কম তবে কাঠ আর তক্তার দোতালাগুলো বেশি। নানারকম কারুকার্য খচিত তক্তা দিয়ে সুন্দর করে ঘরগুলো তৈরি করা হয়েছে। কোন কোন বাড়ি বা দোকানের তক্তায় নানা রকম রং-এর আঁচড়। তবে বেশির ভাগ জীব-জন্তুর ছবিই নজরে পড়ে।

জিংহায় লোকজনের চেহারা চীনাদের মতই কিন্তু এরা কিছুটা লম্বাটে। অত্যন্ত পরিশ্রমী আর কর্মঠ এরা, সব সময় কাজ নিয়েই মেতে থাকতে ভালবাসে।

পিউলপাং হোটেলের সম্মুখ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেটা পিচ-ঢালা মসৃণ নয়, লাল কাঁকড় বিছানো পথ। তাই এ পথে সৌখিন গাড়ি বড় একটা নজরে পড়ে না। শুধু মালবাহী বড় বড় ট্রাকগুলো এ পথে যাওয়া আসা করে। এসব গাড়িগুলো যখন চলে যায় বা আসে তখন রাশিকৃত ধূলো লাল ধোঁয়ার মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই পথের ধারের বাড়ি ঘর এবং দোকানগুলোর দেহ তাই লালচে পান খেকোর দাঁতের মত কতকটা।

হোটেল পিউলপাং এর যে জায়গাটায় বসে দস্যু বনহুর সিগারেট পান করছিলো সে জায়গা থেকে পথটার কিছু অংশ স্পষ্ট নজরে আসে।

বনহুরের পাশের টেবিলে বসে কয়েকজন চীনা শ্রমিক কফিপান করছিলো এবং তারা চীনা ভাষায় নানা রকম আলাপ আলোচনা করছিলো। বনহুরের চীনা ভাষা ভাল জানা না থাকলেও সে একটু আধটু বলতে এবং বুঝতে পারতো। বনহুরের দৃষ্টি বাইরের পথটার দিকে থাকলেও কান তার সজাগ ছিলো শ্রমিকগণ কি নিয়ে আলাপ আলোচনা করছে এটাই সে মনোযোগ সহকারে শুনছিলো।

বনহুর হঠাৎ চমকে উঠলো, কে যেন তার কাঁদে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ফিরে তাকালো সে ধীরে ধীরে, আশ্চর্য না হলেও কিছুটা বিস্মিত হলো বনহুর। একটি তরুণী তার কাঁধে হাত রেখে দিব্য দাঁড়িয়ে আছে। মৃদু মৃদু হাসছে তরুণী, তার চোখ দুটো উজ্জ্বল দীপ্ত।

বনহুরকে ফিরে তাকাতে দেখে তরুণী ইংরেজিতে বললো— তুমি বুঝি নতুন লোক?

বনহুর ইংরেজিতে উত্তর দিলো— হাঁ নতুন এসেছি জিংহায় তুমি কে জানতে পারি কি?

বনহুর কথায় মেয়েটা হেসে বললো— এখানকার সবাই আমাকে চিনে? তুমি নতুন বলেই আমাকে চিনতে পারছো না। আমি এই হোটেলের মালিকের মেয়ে।

অনেকটা সচ্ছ হয়ে আসে বনহুর, কারণ মেয়েটা আচমকা তার কাধে হাত রাখায় কিছুটা বিব্রত বোধ করছিলো সে, যেহেতু মেয়েটি তার সম্পূর্ণ অপরিচিতা।

বনহুর মেয়েটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ম নজরে দেখে নিলো। শরীরে আট সাট পোশাক, প্যান্ট, হাওয়াইসার্ট, মাথায় ক্যাপ, গলায় টাই ও পায়ে জুতো। এবার বনহুর ওকে লক্ষ্য করে বললো— তোমাকে মেয়ে বলে মনেই হয় না, যা হোক এবার বলোতো তোমার নাম কি?

তরুণী স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলো—আমার নাম হুংমা।

বনহুর তরুণীর নামটা একবার উচ্চারণ করলো—হুংমা।

হাসলো তরুণী।

বনহুর তাকালো ওর মুখের দিকে।

তরুণী বললো—তুমি কি এই হোটেলে থাকতে চাও?

হাঁ।

বেশ এসো আমার সঙ্গে তোমার জন্য বাবাকে বলবো।

চলো, দেখো আমার কোন অসুবিধা না হয়।

না না, তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

বনহুর তার সুটকেসটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

তরুণী বলে—এসো আমার সঙ্গে।

হোটেল পিউলপাং সম্পূর্ণ তক্তা এবং কাঠ দিয়ে তৈরি। হোটেলের সিড়িগুলোও মোটা তক্তার। বনহুর আর হুংমা সিড়ি বেয়ে উঠে গেলো উপরে।

নিচে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, উপরে থাকার ঘর। বড় বড় দুটো কক্ষ। এক একটা কক্ষে প্রায় বিশখানা বেড রয়েছে। বড় ঘর দু'খানার মাঝখানে সিড়িঘর, সিড়িঘর খানার পাশেই হোটেলের মালিক হুংমার বাবার বসবার ঘর।

বনহুর সহ হুংমা কক্ষে প্রবেশ করেই ডাকলো— বাবা নতুন লোক এসেছে। আমাদের হোটেলেই থাকবে।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো ওপাশে হাতলভাঙ্গা একটা চেয়ারে বসে আছে বিশাল দেহী একটা লোক। অবশ্য বেশি লম্বা নয় শুধু প্রশস্ত দেহ, চোখ দুটো অত্যন্ত ক্ষুদ্র। এক জোড়া গোফ নাকের নিচে কাঠবিড়ালীর লেজের মত ঝুলে আছে।

শরীরে একটা ফতুয়া আর তহবন।

মাথার উপরে বন বন করে একটা ফ্যান ঘুরছে তবু লোকটার ফতুয়া ঘেমে চুপসে গেছে।

ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটো তুলে বনহুরকে দেখে নেয়, তারপর বলে হুংমার বাবা—তোমাকে তো জিংহার লোক বলে মনে হচ্ছে না।

বনহুর বলে—আমি জিংহাবাসী নই।

তবে কোথা থেকে এসেছো? বললো আবার হুংমার বাবা।

বনহুর জবাব দিলো, ঝাঁম শহর থেকে এসেছি।

ঝাঁম শহর?

হাঁ।

একটু কিছু ভেবে নিয়ে বললো— ঝাঁম শহর থেকে জিংহায় এসেছো, এতো দূরে কি কাজ তোমার?

বনহুর ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দ্রুত চিন্তা করে বললো— আমার বড় ভাই হারিয়ে গেছে তারই খোঁজে এসেছি।

বললো হুংমার বাবা—হুঁ। তা কত টাকাপয়সা সঙ্গে নিয়ে এসেছো?

বেশি নয়।

তবে কি করে হোটেলে থাকা খাওয়ার খরচ জোগাবে?

সে আমি চালিয়ে নিতে পারবো।

তবু কেমন করে চালাবে শুনতে হবে তো? জানতো আমার হোটেলের পয়সা লাগে কম কিন্তু আমি বাকি বকেয়ার ধার ধারিনা।

বাকি আমি করবোনা কিছু, সব নগদ দেবো।

পাবে কোথায়?

কাজ করবো।

কাজ করবে?

হাঁ।

কি কাজ করতে পারো তুমি?

যে কাজ পাবো সেই কাজই আমি করতে পারবো।

বেশ তাহলে কোনো অসুবিধা হবেনা। খাতাটা সামনের টেবিলে মেলে ধরে বললো হুংমার বাবা— বলো তোমার নাম কি?

নাম?

হাঁ।

নাম আমার রাজা।

খিল খিল করে হেসে উঠলো হুংমা সে এতোক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো বাপ এবং লোকটার কথাগুলো। এবার রাজা নামটা শুনে সে হেসে উঠলো।

বনহুর তাকালো হুংমার মুখের দিকে।

ওর বাবা বললো— রাজা তোমার নাম তোমার বাবার নাম কি?

বাবার নাম আমি জানিনা।

সে কি নিজের বাবার নাম জানোনা তুমি? অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো হুংমা।

ওর বাবা বলে উঠলো—অনেক ক্ষেত্রে বাবার নাম জানা থাকে না বুঝলে হুংমা।

সেকি রকম বাবা?

যেমন ধরো ছোট বেলায় যে হারিয়ে যায় সে তার বাবার নাম কেমন করে জানবে। যেমন ধরো আমি আজও আমার বাবার নাম জানিনা।

হুংমা বলে উঠে — তুমি তোমার বাবার নাম জানোনা?

না মা।

আশ্চর্য বটে। কথাটা টেনে টেনে উচ্চারণ করলো হুংমা।

বনহুর বললো— তেমনি আমিও হারিয়ে গেছি খুব ছোট বেলায় তাই বাবার নাম জানি না।

বেশ তোমার নাম আর দেশের ঠিকানা লিখে রাখলেই চলবে। যাও হুংমা ওকে ওর বিছানা দেখিয়ে দাওগে। হাঁ মনে রেখো আমি কিন্তু বাকি বকেয়া কাজ করিনা।

হেসে বললো বনহুর— না না, বাকি বকেয়া আমিও রাখিনা।

হুংমা কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিলো, থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে পিতার দিকে তাকিয়ে বললো— বাবা একে দেখে মনে হচ্ছেনা ফাঁকি দেবে। তাছাড়া আমার চোখকেও ফাঁকি দিতে পারবে না।

বনহুরও হুংমার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, সেও হুংমার বাবার মুখে তাকিয়ে দেখে নিলো এবং একটু হাসলো।

হুংমা এগুলো—চলো।

তক্তার লম্বা বারেন্দা বেয়ে একটা ঘরে প্রবেশ করলো হুংমা। বনহুরও তার পিছনে পিছনে প্রবেশ করলো ঘর খানার মধ্যে।

ঘরের মেঝেতে দু সারি তক্তার চৌকি পাতা। প্রত্যেকটা চৌকির উপর একটি কম্বল আর একটি বালিশ রয়েছে। এক একটা চৌকির পাশে এক একটা ছোট্ট টেবিল। টেবিলে চৌকির মালিকদের সামান্য যা জিনিস তা সাজানো থাকে।

একটি চৌকি দেখিয়ে বললো হুংমা— তুমি ঐ এক কোণের চৌকিটা পাচ্ছো।

হেসে বললো বনহুর— ভাল।

হুংমা আবার বললো— তোমার জন্য মাঝের একা চৌকি দিতাম কিন্তু এ সবগুলো রিজার্ভ হয়ে গেছে। দেখতেই পাচ্ছো প্রত্যেকটা টেবিলে আগন্তুকদের জিনিসপত্র।

হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি। বনহুর কথাটা বলে ওদিকের শূন্য চৌকিটার উপরে তার সুটকেসটা রেখে বসে পড়লো।

হুংমা বললো— তোমার চৌকির কম্বল আর বালিশ এক্ষুণি পেয়ে যাবে।

বেশ আমি বিশ্রাম করে নি।

তোমাকে দেখে অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

হাঁ, আমি ক্লান্ত বটে। কম্বল এবং বালিশটা পেলে আমি এক চোট ঘুমিয়ে নেবো।

একটু হেসে বেরিয়ে গেলো হুংমা।

বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো, জিংহা তার কাছে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা দেশ। এখানের মানুষ সম্বন্ধে তার কোন রকম ধারণা নেই। না জানি জিংহায় তার কেমন কাটবে। যদিও বনহুর ইচ্ছা করলে জিংহার বড় কোন হোটেলে উঠতে পারতো কিন্তু সে তা করিনি। কারণ সে চায় জিংহার আসল রূপ উদঘাটন করতে এবং সে জন্যই বনহুর বেছে নিয়েছে জিংহার সব চাইতে নিকৃষ্ট হোটেল পিউলপাং। কুলি, মজুর, শ্রমিকদের মধ্যে ডুব দিয়ে সে জানতে চায় তাদের জীবন যাত্রা কোন স্তরের। দোতালার মানুষ আর নিচ তলার মানুষের মধ্যে কতখানি তফাৎ। এ দেশে যদিও তার

উদ্দেশ্য হামবার্টকে খুঁজে বের করা। এই হোটেলখানা তার কাছে মন্দ লাগছে না, এখানে নানা ধরনের মানুষ আনা-গোনা হয়। হোটেলের মালিককে মোটামুটি বিশ্বাস করা যায়, যদিও তার চোখ দুটো শিয়ালের চোখের মত ধূতমিতে ভরা। মেয়েটা ভাল এবং সাদা-সিদে হতে পারে তবে....

বনহুরের চিন্তা ধারা এলো মেলো হয়ে যায়। হুংমা বগলে একটা বালিশ আর কম্বল নিয়ে হাজির হয়। বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে— এই নাও তোমার কম্বল আর বালিশ। হাঁ ঘুমিয়ে নাও খুব করে।

বনহুর বললো— কিন্তু পেট যে আমার খিদেয় চোঁ চোঁ করছে।

বেশ তো নিচে যেয়ে খেয়ে এসো।

কিন্তু পা যে আমার নামছে না।

মানে?

মানে, পাদুটো অবশ হয়ে গেছে।

বেশ টাকা দাও, আমি তোমার খাবার এনে দিচ্ছি।

সত্যি হুংমা তুমি আমার খাবার উপরে এনে দেবে?

বাঃ তুমি যে বললে তোমার পা নামছে না?

হাঁ, পাদুটো একেবারে..

বুঝছি, বসো আমি তোমার খাবার নিয়ে আসছি। ঐ যে ওদিকে যে দরজা দেখছো ওটা বাথরুম, ওখান থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসোগে। দাও টাকা দাও।

বনহুর পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে হুংমার হাতে দেয়।

হুংমা চলে যায়।

বনহুর উঠে দাঁড়ায়। শরীরটা তার বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছিলো কারণ কান্দাই থেকে জিংহা শুধু হাজার হাজার মাইলই দূরে নয় মাঝখানে কয়েকটা পাহাড় পর্বত এবং সাগরও রয়েছে। শুধু প্লেনেই সে আসেনি জাহাজেও তাকে আসতে হয়েছে ক'দিন। বাথ রুমে প্রবেশ করে হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে আসে।

এমন সময় ফিরে আসে হুংমা, হাতে তার খাবারের থালা।

বনহুর হাত মুখ না মুছেই টেবিলে বসে পড়ে।

হুংমা খাবারের থালাটা টেবিলে রাখতেই বনহুর গোগ্রাসে খেতে শুরু করে।

হুংমা কতটা অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো। ভাবছিলো লোকটা তো কম নয়, তার হাত থেকে থালা রাখতে না রাখতে কেমন তাড়া হুড়ো করে খেতে শুরু করে দিলো। হুংমা পকেট থেকে বাকি টাকাগুলো বের করে বনহুরের দিকে বাড়িয়ে ধরলো —তোমার টাকা নাও।

বনহুর খেতে খেতে জবাব দিলো—ও গুলো তোমার কাছে রেখে দাও।

কেনো, তুমি নেবেনা?

না।

সেকি?

কিছু না, তুমি যাও।

হুংমার চোখ দু'টো আনন্দ দীপ্ত হয়ে উঠলো, সে দু'ঠোঁটের ফাঁকে আংগুল রেখে আনন্দ সূচক শব্দ করে উঠলো তারপর সিড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে গেলো নিচে।

বনহুর খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়লো তার নিকৃষ্ট বিছানায় লম্বা হয়ে। জুতো জোড়া পায়েই রইলো নাক ডাকা শুরু হলো ওর।

সবে মাত্র ঘুমটা জমে উঠেছে এমন সময় কয়েকজন শ্রমিক উঠে আসে উপরে।

হঠাৎ একজনের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে বনহুরের উপর। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকটা আংগুল দিয়ে সঙ্গীদের দৃষ্টি বনহুরের দিকে আকর্ষণ করে। সবাই এগিয়ে যায় ওর বিছানার পাশে, অবাক চোখে দেখতে থাকে বনহুরকে। নতুন এক আগন্তুককে তাদের আস্তানায় দেখতে পেয়ে রাগে হিংসায় জ্বলে উঠে ওদের মন। যে শ্রমিকটা সবার আগে এগিয়ে গিয়েছিলো, সে সঙ্গে সঙ্গে ওর নাকে মুখে চালায় ঘুষির পর ঘুষি।

বনহুর আচমকা এমন অবস্থার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলোনা। তাও সে ঘুমের ঘোরে অচেতন সেই সময় এই ঘটনা। বনহুর কয়েক মিনিটেই টাল সামলে নিলো তারপর সে পাল্টা ঘুষি চালাতে শুরু করলো দুমা-দুম, দুমা-দুম--- দু'চার মিনিটের মধ্যেই শ্রমিকগণ কে কোন দিকে পালাবে তার পথ পেলোনা। কারো বা দাঁত ভাংলো, কারোও বা নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো, কারো বা কপাল কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়লো।

কক্ষটা সম্পূর্ণ খালি হয়ে গেলো।

বনহুর এবার জামার আস্তিন মেলে দিতে দিতে বিছানায় বসে পড়লো। ভাবলো এবার হোটেলের মালিক সহ ওরা এসে হাজির হবে তার কাছে, নানারকম কৈফিয়ৎ তলব করে বসবে।

কিন্তু বেশ কিছু সময় কেটে গেলো কেউ এলোনা। মালিক বা শ্রমিকগণ কারো পাত্তা নেই। বনহুর আবার শুয়ে পড়লো বিছানায়। কিন্তু প্রথম বারের মত এবার চট্ করে ঘুম এলোনা তার চোখে।

তারপর হঠাৎ যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই বনহুরের। ঘুম ভাংতেই চোখ মেলে তাকালো, ভোর হয়ে গেছে কখন। হাই তুলে বিছানায় উঠে বসে তাকালো কক্ষ মধ্যে। সে অবাক হয়ে দেখলো যার যার বিছানায় সে সে শুয়ে আছে সবাই ঘুমে অচেতন।

বনহুর ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো।

বনহুর অনুমানেই বুঝে নিয়েছে শ্রমিকগণ তার কাছে মার খেয়ে নিশ্চয়ই মালিকের কাছে গিয়েছিলো— নালিশ জানিয়েছিলো তার কাছে কিন্তু তাদের সব শুনে মালিক নিশ্চয়ই ওদের খুব করে বকে দিয়েছে যার জন্য ওরা নীরবে এসে যার যে জায়গা দখল করে নিয়ে শুয়ে পড়েছে।

পরদিন।

বনহুর লক্ষ্য করলো শ্রমিকরা সবাই যেন বনহুরকে কেমন সমীহ করে চলছে। হয়তো বনহুরের কাছে গতরাতে মার খেয়ে ওরা সোজা হয়ে গেছে।

আর হবেই না বা কেনো, কম মার খায়নি ওরা বনহুরের কাছে। এখনও ওদের চোখ মুখ চোয়ালগুলো ফুলে ফুলে আছে। কম কি ব্যথা, সমস্ত রাত ওরা ভাল করে ঘুমোতে পর্যন্ত পারেনি।

শ্রমিকদের সর্দার ভেবেছিলো এ লোকটা আবার কে? চেহারা দেখেই ওরা বুঝতে পেরেছিলো— সে এদেশের বাসিন্দা নয়, তাই ওরা বনহুরকে ঘুমন্ত অবস্থায় মারতে শুরু করে দিয়েছিলো। ওরা জানতো না ওর গায়ে কেমন শক্তি। টের পেয়ে গেলো একটু পরেই। সে কি ভীষণ আঘাত শ্রমিকরা মার খেয়ে পালানোর পথ পেলো না। গিয়েই নালিশ জানালো হুংমার বাবার কাছে ,সব কথা ওরা বললো— যার যা মুখে এলো সেইভাবে।

হুংমার বাবা সব শুনে অবাক হলো, বললো— তোমাদের মতই সেও আমার হোটেল বাসিন্দা কাজেই তোমাদের মতই তারও অধিকার আছে এ হোটেলে।

তখন মুখ চুন করে সবাই সরে গিয়েছিলো অবশ্য তারা দল বেঁধে পরামর্শও করেছিলো ওকে কেমন করে জব্দ করবে। তারা কিন্তু অনেক শলা-পরামর্শ করেও কারো সাহসে কুলালো না ওকে জব্দ করবে কেমন করে।

একজন নাম তার চিংচু, লোকটা বয়সে কম হলেও বুদ্ধি ভাল রাখে সেই বলেছিলো, ওকে জব্দ করে কাবু করার চেয়ে ওর সঙ্গে মিল লাগানো অনেক ভাল।

অপর একজন বলেছিলো— কেনো ওর সঙ্গে মিল লাগাতে হবে?

বলেছিলো চিংচু.... ওমন একজন হিম্মৎওয়ালা লোক আমাদের দলে থাকা অনেক ভাল। দেখলে তো এক সঙ্গে কতগুলো লোককে সে একাই কাবু করে ফেললো।

চিংচুর কথাগুলো মিথ্যা নয়, ভেবে দেখছিলো ওরা এবং সেই কারণেই ওরা সবাই মনোস্থির করে ফেলেছিলো যেমন করে হোক ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে।

বনহুর যখন নীচে টেবিলে খাচ্ছিলো তখন শ্রমিকদের সর্দার এসে বসলো ঐ টেবিলে।

বনহুর খেতে খেতে আড় নজরে তাকিয়ে দেখলো লোকটার চ্যাপ্টা নাকটা এখনও ফুলে আছে। ঠোঁটের একপাশে কালো জখম, কপালের মাঝখানে তুলো লাগানো রয়েছে এখনও। মুখ টিপে একটু হাসলো বনহুর, সে জানে তারই মুষ্ঠিঘাতে ওর এ অবস্থা।

অদূরে টেবিলে আরও কয়েকজন ফিস ফিস করে কি সব কথাবার্তা বলছে। ওদের চোখে মুখেও গত রাতের বনহুরের কাছে পাওয়া উত্তম মধ্যমের চিহ্ন।

বনহুর নীরবে খাবার খাচ্ছিলো।

লোকটা তার পাশে বসায় বনহুর আন্দাজ করে নিলো ওরা আজ আবার তার উপর আক্রমণ চালাবে। লোকটা বয়ের কাছে খাবারের অর্ডার দিলো।

খাবার এলো।

দুটো মুরগীর রোষ্ট এনে রাখলো বয়টা।

বনহুর মনে করলো তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে লোকটা ঐ মুরগীর রোষ্ট দুটো খাবে। শক্তিতে পারেনি তাই দুটো মুরগীর রোষ্ট এক সঙ্গে খেয়ে নিজের শক্তির পরিচয় দেবে। কিন্তু পরক্ষণেই বনহুরের ভুল ভাংলো।

লোকটা মুরগীর রোষ্টসহ একটা প্লেট এগিয়ে দিলো বনহুরের দিকে— বন্ধু এটা তুমি খাও।

অবাক হয়ে চোখ তুললো বনহুর।

লোকটা হেসে বললো—তোমার সঙ্গে আমরা বন্ধুত্ব করতে চাই।

প্রথমে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠলো বনহুরের ঠোঁটের ফাঁকে। পরক্ষণেই অবশ্য তার ভুল ভাংলো, লোকটা মাংসের রোষ্ট খানা সত্যি সত্যি তুলে দিলো বনহুরের থালায়, বললো— খাও। তুমি খেলে আমরা সবাই খুশি হবো।

ততক্ষণে ওরা সবাই এসে দাঁড়িয়েছে বনহুরের টেবিলটার চারপাশে। ওরা সবাই বলে উঠলো— হাঁ, তুমি খেলে আমরা সবাই খুশি হবো।

বনহুর বললো— ধন্যবাদ, এমনি তোমরা আমার বন্ধু হলে। এটা আমি খেতে পারবো না কারণ খাওয়া আমার শেষ হয়ে গেছে। থালাটা সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো সে।

সর্দার প্রথমে বনহুরের হাতে হাত মিলালো।

পরে সবাই এক এক করে হাত মিলালো ওর সঙ্গে।

সবারই যখন হাত মিলানো শেষ হয়ে গেছে তখন হুংমা এগিয়ে এলো —তুমি আমারও বন্ধু।

বনহুর ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেই হুংমা দ্রুত হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডসেক করলো ওর সঙ্গে।

এমন সময় একটি গাড়ি এসে থামলো হোটেল পিউলপাং এর সম্মুখে।

গাড়ি থামতেই গাড়ি থেকে নেমে এলো একটি লোক। সমস্ত শরীর তার মনি মুক্তা খচিত পোশাক পরিচ্ছদ। লোকটা হোটেলের দরজায় দাঁড়াতেই সমস্ত শ্রমিক মজুরের দল ভয় বিহ্বল হয়ে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলো।

লোকটা চীনা ভাষায় কি সব বললো তারপর বেরিয়ে গেলো।

বনহুর লক্ষ্য করেছিলো যতক্ষণ লোকটা হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলো ততক্ষণ হোটেলস্থ সবার মুখ ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিলো।

লোকটা চলে যেতেই হোটেলস্থ শ্রমিকগণের মুখমণ্ডল স্বাভাবিক হলো।

বনহুর শ্রমিকদের সর্দারকে লক্ষ্য করে বললো— এই লোকটা কে?

শ্রমিকদের সর্দার কপালের ঘাম মুছে ফেলে বললো— চীনা দুস্যু হামবার্টের নাম শুনেছো? এ তারই প্রধান সহকারী ফাংফা।

মুহূর্তে বনহুরের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো যেন। আপন মনেই বলে উঠলো চীনা দস্যু হামবার্ট।

শ্রমিক সর্দার বললো— হাঁ, চীনা দুস্য হামবার্ট। শুধু দস্যুতাই সে করে না তার নানা রকম ব্যবসাও আছে।

জানি চোখের আর রক্তের ব্যবসা...

তুমি নতুন মানুষ হয়ে হামবার্টকে চিনলে কি করে?

আমিও যে এক সময় হামবার্টের সঙ্গে ব্যবসা করতাম।

সবার চোখে একটা আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠলো, এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ী করে নিলো।

বনহুর বললো— কোন ভয় বা দুঃচিন্তার কারণ নেই তোমাদের। আমি এখন আর হামবার্টের সঙ্গে ব্যবসা করি না। তাছাড়া আমার শুধু পরিচয় হামবার্টের সঙ্গে, তার সহকারী বা সহচরদের সঙ্গে আমার তেমন কোন জানাশোনা নাই।

সেদিনের পর থেকে বনহুরের সঙ্গে পিউলপাং হোটেলের শ্রমিকদের গভীর একটা বন্ধুত্ব জমে গেলো। বনহুরের শক্তির পরিচয় তাদের জানা হয়ে গিয়েছিলো তাই তারা সবাই ওকে মেনে চলতো।

শ্রমিকরা যখন কাজে বের হতো তখন বনহুরও তাদের সঙ্গে যেতো। কাজ শেষে এক সঙ্গে ফিরে আসতো তারা সবাই মিলে।

মিলে মিশে ওরা হই হুলোড় করে খাওয়া-দাওয়া করতো। হুংমা নিজে বনহুরের জন্য খাবার নিয়ে অপেক্ষা করতো, কোন কোন দিন সে নিজেও না খেয়ে প্রতিক্ষা করতো।

এক সপ্তাহ কেটে গেলো তারপর দু'সপ্তাহ গড়িয়ে চললো। বনহুর প্রথম প্রথম হুংমার আচরণে তেমন কিছু মনে করতো না। কিন্তু পরপর সে বুঝতে পারলো, হুংমাও খান বাহাদুর আমির আলীর মেয়ে নীলার মত তার প্রতি অনুরাগীনী হয়ে পড়েছে। বনহুর যতদূর সম্ভব ওকে এড়িয়ে চলতো। রাতে যখন সে শুইতে যেতো তখন চুপি চুপি পা টিপে টিপে নিজের বিছানার দিকে এগুতো। তবু কোথায়? হুংমা যে সজাগ হয়ে থাকতো। বনহুরের সম্মুখে এসে দাঁড়াতো সে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বলতো— এতোক্ষণ কোথায় ছিলে রাজা?

বনহুর এ হোটেলে রাজা নামেই পরিচিত হয়ে গেছে। হোটেলের মালিক হুংমার বাবা চাচুচিং থেকে শুরু করে হোটেলের বয় পর্যন্ত তাকে ঐ নামে ডাকে।

বনহুর এতে খুশি হয়।

হুংমা যখন তাকে প্রশ্ন করে বসলো, এতোক্ষণ কোথায় ছিলে রাজা? তখন একটা প্রচণ্ড রাগ তার মনে তোলপাড় জাগালো। সে এতোক্ষণ কোথায় ছিলো না ছিলো এর কৈফিয়ৎ হুংমাকে দিতে হবে কেন? কি তার অধিকার তাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করার।

হুংমা পথ আগলে দাঁড়ালো— কোথায় গিয়েছিলে, বলবে না রাজা?

রাজা ওর পাশ কেটে ততক্ষণে নিজের চৌকির উপর গিয়ে বসেছে। সে উবু হয়ে পা থেকে জুতো জোড়া খুলতে লাগলো।

হুংমা মাথার ক্যাপটা খুলে বগলে রেখে অভিমানের স্বরে বললো—বেশ বলবে না তো আমি আর কোন কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো না।

ওপাশের বিছানায় শুয়ে শুয়ে জবাব দিলো চিংচু—হুংমা তুমি বড্ড বেশি কথা বলো। দেখছো না রাজা পরিশ্রম করে কেমন ক্লান্ত হয়ে এসেছে। একটু বিশ্রাম করতে দাও।

অপর বিছানা থেকে মাংতুচিং বলে উঠলো—হুংমা রাজাকে ভালবাসে তাই সে ওর খুটি নাটি জিজ্ঞাসা না করে পারে না। বলো না রাজা এতোক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?

আসলে রাজা আজ শ্রমিকদের সঙ্গে কাজে যায়নি, সে গিয়েছিলো আর এক উদ্দেশ্য নিয়ে। জিংহার অনেক জায়গা তার এখনও দেখা হয়নি, রাজা সত্যিই বললো—আজ কাজে যাইনি।

তবে কোথায় গিয়েছিলে?

ঘনিষ্ঠ আপন জনের মত জিজ্ঞাসা করলো আবার হুংমা।

রাজা জুতো জোড়া খুলে একপাশে রাখতে রাখতে বললো— জিংহা শহরটা দেখতে গিয়েছিলাম।

খিল খিলিয়ে হেসে উঠলো হুংমা—তুমি বড্ড বোকা একা একা কতটুকু দেখলে? যদি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে তবু হতো।

চিংচু বলে উঠলো— তুমিই বা কতটুকু জানো, জিংহা এতোটুকু শহর নয়, বুঝলে হুংমা— যে তুমি ওকে সব দেখাবে।

হুংমা রাগোত কণ্ঠে বললো— তবে তুমি বুঝি ওকে সঙ্গে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাও? মনে রেখো ওকে আমি তোমার সঙ্গে একদিনও বাইরে যেতে দেবোনা।

চিংচু বিছানায় উঁবু হয়ে শুয়ে শুয়ে কথা বলছিলো— এবার সে উঠে বসে সোজা হয়ে, চোখে মুখে বিস্ময় টেনে বলে— কেনো? কেনো আমার সঙ্গে ওকে যেতে দেবে না?

তুমি বড় মন্দ লোক তা কি আমি জানিনা। তুমি প্রায়ই মদ খাও। ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তুমি মদ খাওয়া শেখাবে।

কি বললে হুংমা? আমি মদ খাওয়া শেখাবো ওকে? আমার নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে ওকে মদ খাওয়া শেখাবো। আমি যেন বড় দায়ে ঠেকে গেছি।

রাজা দেখলো ওরা তাকে নিয়ে অহেতুক কলহ বাঁধিয়ে বসলো, তাই সে হুংমাকে লক্ষ্য করে বললো— তুমি যাও হুংমা আমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বো।

হুংমা রাগাত দৃষ্টি নিয়ে একবার চিংচুর দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেলো।

পরদিন একথা নিয়ে তাদের সর্দার হিয়ংচুর সঙ্গে গোপনে আলাপ করলো চিংচু।

হিয়ংচু তখন মদের নেশায় ঢুলু ঢুলু। চিংচু গিয়ে বললো— সর্দার, জানো হুংমা আমাদের সবাইকে অপমান করেছে।

হুংমা আমাদের সবাইকে অপমান করেছে বলিস কি চিংচু!

হাঁ সর্দার।

বল, কি অপমান সে করেছে? আমরা তার বাবার হোটেলে থাকি, পয়সা দিয়ে থাকি খাই। সে আমাদের অপমান করার কে?

শুধু অপমান নয় আমরা মদ খাই এ নিয়েও সে ঐ নতুন লোকটার সামনে আমাকে অপমান করেছে। আমাকে অপমান মানে আমাদের সবাইকে অপমান।

তাতো বটেই, জড়িত কণ্ঠে বললো হিয়ংচু। তারপর আবার বললো— তুই যা, আমি ওকে দেখে নেবো। মালিকের মেয়ে বলে তাকে আমি খাতির করবোনা।

সর্দার হিয়ংচু হুংমাকে ভিতরে ভিতরে ভালবাসতো ওর প্রেমের জন্য লালায়িত ছিলো সে। চিংচুর কথাগুলো তাই ওকে বেশি ভাবিয়ে তুললো, বললো আবার সে—চিংচু, তুই কি বলতে পারিস হুংমা রাজাকে ভালবাসে?

চিংচু মাথা চুলকে বলে— হয়তো বাসে, না হলে সে ওর প্রতি অমন দরদ দেখায় কেনো।

এমন সময় হুংমা এসে দাঁড়ায়, বলে হুংমা— চিংচু, তুমি কার কথা নিয়ে আলাপ করছো?

কেনো তোমার কথা। কাল তুমি ঐ রাজার সামনে আমাকে কেমন করে অপমান করলে?

অপমান করেছি তোমাকে?

করলে না? আমি মদ খাই রাজাকে মদ খাওয়া শেখাবো বলোনি তুমি?

বলেছি, যা সত্যি তাই বলেছি।

এবার হিয়ংচু বলে উঠে —হুংমা তোমার দেশের লোক, সে কোথাকার কে? তার জন্য তুমি আমাদের যা-তা বলবে? যা-তা কখন বললাম? সত্যি সে ভাল, তাকে তোমরা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তোমাদের মত খারাপ অভ্যাস করবে তা আমি বরদাস্ত করবো না। কথাটা বলে দ্রুত চলে যাচ্ছিলো হুংমা।

সর্দার হিয়ংচু পথ আগলে দাঁড়ালো— হুংমা তুমি তারে ভালবাসো নিশ্চয়ই।

হাঁ, বাসি।

জানো তোমার বাবা যদি জানতে পারে তোমার কি অবস্থা হবে?

জানি।

মনে রেখো হুংমা এরপর যদি ওকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে কোন রকম কলহ করো তাহলে আমরা সব কথা তোমার বাবাকে বলে দেবো।

বেশ দিও কিন্তু মনে রেখো তোমরা যদি আমার নামে আমার বাবার কাছে কিছু যা-তা লাগাও আমিও তোমাদের ক্ষমা করবো না। এ হোটেল তোমাদের ছাড়তে হবে। কথাটা বলে এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে বেরিয়ে গেল হুংমা।

এতোক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো রাজা। সে ঐ সময় হোটেলে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো হঠাৎ হুংমার সঙ্গে হিয়ংচুর কথাগুলো কানে যায় তাই সে আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো।

হুংমা বেরিয়ে যেতেই অপর দরজা দিয়ে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে রাজা। সোজা সে একটা টেবিলে গিয়ে বসে এক গেলাস কফি আনার জন্য বয়কে নির্দেশ দেয়।

হঠাৎ রাজাকে কক্ষ মধ্যে আসতে দেখে প্রথমে হিয়ংচু দলবল সহ ঘাবড়ে যায়। এ-ও তাকায় এও-র মুখে।

বনহুর যেন কিছু শোনেনি। এমনি ভাব টেনে সিগারেট কেসটা বের করে নিজে একটা সিগারেট ঠোঁটের ফাঁকে গুজে সিগারেট কেসটা বাড়িয়ে ধরে হিয়ংচুর সামনে।

এতোক্ষণে হিয়ংচুর মুখভাবটা প্রসন্ন হয়ে আসে। সে ভাবে তাহলে রাজা হুংমার সঙ্গে তাদের কথা বার্তার কিছু শোনেনি। হৃদকম্পটা কমে আসে ওর ধীরে ধীরে। হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট তুলে নেয় সে তারপর সঙ্গীদের ডেকে বলে—নে, রাজার কেস থেকে সিগারেট নে। রাজা বড় ভাল মানুষ।

রাজার হাতের সিগারেট কেস থেকে ওরা এক একটা করে সিগারেট তুলে নিলো।

রাজা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে এক মুখ ধোয়া ত্যাগ করে বললো—এতোক্ষণ হুংমার সঙ্গে কি কথা হচ্ছিলো তোমাদের হিয়ংচু?

না না ও কিছু নয় রাজা ও কিছু নয়। একটা সামান্য কথা নিয়ে ওর সঙ্গে-----

আমি সব শুনেছি হিয়ংচু। শোন আমার ব্যাপার নিয়ে কোন সময় হুংমার সঙ্গে কোন রকম গণ্ডগোল করোনা। করলে ভাল হবেনা বুঝলে?

ঢোক গিলে বললো হিয়ংচু—বুঝেছি।

ওর সঙ্গীরা একবার হিয়ংচুর সঙ্গে মুখ চাওয়া চাওয়ী করে নিলো।

❑

সেদিন বনহুর একাই বসেছিলো দোতালার রেলিংএর ধারে। বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ওদিকের তক্তার বেড়া ঘরগুলোর আড়ালে ধীরে ধীরে সূর্যাস্তের শেষ রশ্মির আভাটুকু মিলিয়ে যাচ্ছে।

তক্তার ঘরগুলোর চালে দু'একটা কাক পাখা ঝাপটে কা কা রব তুলেছে হয়তো বা বেলা শেষে বাসায় ফিরে যাবার জন্য সঙ্গীর সন্ধান করছে।

এখনও হোটেলের স্থায়ী বাসিন্দারা ফিরে আসেনি। হোটেল পিউলপাং নীরব নিঝুম শান্ত। ওরা ফিরে এলে ঘুম ভাংবে পিউলপাং এর। সমস্ত হোটেলটা তখন অশান্ত বালকের মত চঞ্চল হয়ে উঠবে, মুখর হয়ে উঠবে বিয়ে বাড়ির মত।

শা টেবিলগুলোর উপরে তখন কাঁচা চামচ আর চীনা মাটির বাসনগুলোর ঠুন ঠান আওয়াজ উঠবে আর তার সঙ্গে নানা রকম কথা বার্তার প্রতিধ্বনি শোনা যাবে।

বহু পুরুষ কণ্ঠের আওয়াজ জড়িয়ে একটি নারী কণ্ঠের কল কল খিল খিল হাসি হোটেলের ভিতরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠবে। হুংমা প্রত্যেকটা টেবিলে গিয়ে একটিবার দাঁড়াবে। কারো বা চুল ধরে একটু টেনে দেবে, কারো বা নাক ধরে কারো গাল টিপেও আদর করবে। তার সঙ্গে সঙ্গে হাসির ফুল ঝুরি ছড়িয়ে দেবে সবার মনে।

হুংমা যেন এ হোটেলের প্রাণ।

হোটেল বাসীরা সবাই তাই ওকে ভাল না বেসে পারে না। হুংমাকে কাছে পাবার জন্য কেউ কেউ বেশ উৎসাহী কিন্তু হুংমা সে ধরণের মেয়ে নয়। সবাই তাকে পেতে চাইলেও সে এখনও কাউকে ধরা দেয়নি, ভালও সে বাসেনি কাউকে।

হুংমা ইচ্ছা মত চলাফেরা করে।

হুংমার চেহারা কেউ কেউ সন্দেহ করতো, হুংমা পিউলপাং হোটেলের মালিক চিহুয়াংচির মেয়ে নয়, কিন্তু সত্যি সে তার মেয়ে যদিও চেহারাখানা বাপ মেয়ের সম্পূর্ণ আলাদা ছিলো।

হুংমার বাবাকে ওর বন্ধুরা বলতো, এ মেয়ে তোমার না আর কারো? অবশ্য সবাই এ কথা বলতো না যারা জানতো হুংমার মা চীনা মেয়ে নয়, হুংমার মা বিদেশী।

এ প্রশ্ন বনহুরের মনেও যে জাগেনি তা নয়। হুংমার দিকে তাকিয়ে ভাবতো বনহুর চিহুয়াংচির চেহারা আর হুংমার চেহারা সম্পূর্ণ পৃথক লাগে। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগলেও সে ইচ্ছা করে কোনদিন এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়নি বা কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেনি।

আজ সকাল সকাল বাহির থেকে ফিরে এসেছে বনহুর। টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়াই ছিলো, বয় এসে আগলা করে দিয়েছে। এ হোটেলে যার যার টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়া থাকে কারণ দুপুরে যারা খায়না এ খাবার তাদেরই জন্য। বনহুর খেয়ে দেয়ে খোলা রেলিং-এর পাশে এসে বসেছে, দৃষ্টি তার পথের দিকে। মাঝে মাঝে মাল বোঝাই ট্রাকগুলো এক রাশ লালধূলো ছড়িয়ে বিকট শব্দ করে চলে যাচ্ছিলো। কোন কোনটা ত্রিপলে ঢাকা আর কোন কোনগুলোর কাঠের বাক্স তবে ত্রিপলে ঢাকা নয়।

বনহুর আপন মনে ভেবে চলেছে আজ ক'দিন হলো সে এই জিংহা শহরে এসেছে। যদিও তার কাছে এ শহরটা সম্পূর্ণ অপরিচিত তবু সে বহু জায়গা

এরি মধ্যে ঘুরে ফিরে দেখেছে, কখন সে অবাক হয়েছে কখনও হতবাক হয়ে গেছে। জিংহা অদ্ভুত শহর।

বনহুর সামান্য শ্রমিকের বেশেই এই হোটেলে উঠেছে। সে যখন বাহিরে যেতো শ্রমিকের বেশে যেতো তবে মাঝে মাঝে হঠাৎ কোন সময় ছদ্মবেশ নিয়ে বেরিয়ে পড়তো। হোটেলের কেউ টের পেতো না, এমন কি হুংমাও নয়।

আজ ক'দিন সে বহু জায়গা ঘুরছে কিন্তু এখনও হামবার্টের কোন সন্ধান পায়নি। যে হামবার্টের প্রধান সহচরটি সেদিন আচমকা এসে হাজির হয়েছিলো হোটেল পিউলপাং-এ তারও কোন খোঁজ মেলেনি আর।

লোকটা হঠাৎ কোথা থেকে এসেছিলো আবার জিংহার জনসমুদ্রের কোথায় সে ডুব মারলো কে জানে? বনহুর কোনক্রমে আর একবার ওর সম্মুখে হাজির হতে পারলে.....

আচমকা বনহুর যেন চমকে উঠলো।

সে স্পষ্ট দেখতে পেলো একরাশ লাল ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে আসছে সেই গাড়িখানা যে গাড়িতে সেদিন এসেছিলো ফাংফা হামবার্টের প্রধান সহচর। আশায় আনন্দে চোখ দুটো তার জ্বলে উঠলো যেন।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো বনহুর সঙ্গে সঙ্গে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রেলিং ছেড়ে নেমে চললো সে তর তর করে নিচে। ততক্ষণে গাড়িখানা এসে থেমে পড়েছে পিউলপাং-এর সামনে। হোটেলে তখন কেউ না থাকায় বনহুর এগিয়ে এলো, সেদিন যে ভাবে হোটেলবাসীরা তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো বনহুর সেই ভাবে ফাংফা শয়তানটাকে অভিনন্দন জানালো।

প্রথমে অবাক হলেও পরক্ষণে ফাংফা নিজকে সামলে নিয়ে বললো— তোমার সঙ্গীরা কোথায়?

বনহুর স্বাভাবিক সচ্ছ কণ্ঠে বললো— তারা এখনও ফিরে আসেনি। যদি অনুগ্রহ করে আমাকে জানান তাহলে....

একটা শব্দ করলো ফাংফা —হু! তারপর বললো— চিংচুকে বলো সে যেন প্রস্তুত থাকে, কাল রাত দুটোর পর আমি আসবো তাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে।

বনহুরের মনটা যেন নেচে উঠলো আনন্দে। না চাইতেই বৃষ্টিপাতের মত অবস্থা। যে কারণে সে সুন্দর কান্দাই থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এই জিংহায় এসেছে। যে কারণে সে আজ ক'দিন থেকে জিংহার নির্দিষ্ট কতকগুলো জায়গা চষে ফিরছে। হঠাৎ সেই শয়তানের অনুচরই এলো তাকে অভিনন্দন জানাতে।

অন্তরের খুশি বনহুর মুখে প্রকাশ করলো না, সে মাথা দুলিয়ে বললো— নিশ্চয়ই বলবো।

ফাংফা বললো— ভুলে যেও না তাহলে কিন্তু তোমার পরিণতি ভয়ঙ্কর মনে রেখো।

রাখবো, নিশ্চয়ই রাখবো.....

হাঁ..... কথাটা উচ্চারণ করে ফাংফা উঠে গিয়ে তার গাড়িতে বসলো।

সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে ওর দেহের মনি মুক্তা খচিত বস্ত্রাদি ঝকমকিয়ে উঠলো যেন। চামচিকের মত গোঁফ জোড়াতে একবার হাত বুলিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো সে।

বনহুর করজোড়ে প্রনিপাত জানাল।

গাড়িতে বসে একটু মাথানত করলো ফাংফা।

গাড়ি চলে গেলো।

এবার বনহুর মনের আনন্দটাকে ধরে রাখতে পারলো না, হেসে উঠলো সে ভীষণভাবে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে হুংমা তার পিছনে এসে দাঁড়ায়। রাজাকে সে একা একা হাসতে দেখে বলে— রাজা তুমি হাসছো কেন?

রাজা তখন হাসি থামিয়ে হুংমার-মাথার ক্যাপটা খুলে নিজের মাথায় পরে বলে— তোমার কথা মনে করে হাসছিলাম হুংমা।

আমার কথা মনে করে?

হাঁ।

তুমি আমার কথা মনে করো রাজা?

করি।

সত্যি বলছো?

সত্যি।

রাজা!

বলো?

তুমি খুব ভাল!

হাঁ। ছোট্ট একটা শব্দ করে মাথার ক্যাপটা খুলে আবার রাজা পরিয়ে দেয় হুংমার মাথায়। বলে রাজা— এতোক্ষণ কোথায় ছিলে হুংমা? একা একা আমার মোটেই ভাল লাগছিলোনা।

হুংমা রাজার বুকের কাছের জামাটা দু'হাতে এটে ধরে বলে— আমি না থাকলে তোমার ভাল লাগেনা বুঝি?

হাঁ। তুমি না থাকলে আমার বড্ড খারাপ লাগে। আচ্ছা হুংমা এতোক্ষণ কোথায় ছিলে তাতো বললেনা? বনহুর জানে হুংমা হোটেলে থাকলে সে চুপ চাপ ঘরের কোণে বসে থাকতো না। বড় চঞ্চল এই মেয়েটি।

রাজার কথায় হুংমার চোখ দুটো ছলছল করে উঠে, কতকটা আনমনা হয়ে যায় সে।

রাজা বলে— হুংমা কোথায় ছিলে বলতে যদি তোমার কোন অসুবিধা থাকে বলোনা।

না কোন অসুবিধা নেই। মায়ের কবর দেখতে গিয়েছিলাম। ও.... রাজা একটা শব্দ করলো।

হুংমা বললো— যাবে একদিন আমার সঙ্গে?

কোথায়?

আমার মায়ের কবর দেখতে?

যাবো।

রাজা তুমি কত ভাল। চিংচু হিয়াংচু ওরা কোন দিন আমার সঙ্গে যায় না।

যখন রাজা আর হুংমার কথা হচ্ছিলো তখন শ্রমিকরা ফিরে আসে হোটেলে। দূর থেকেই ওরা লক্ষ্য করে হুংমা আর রাজা হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

চিংচু হিয়ংচুর কানে মুখ নিয়ে বলে— দেখলে রাজা আর হুংমা কেমন গভীরভাবে কথা বার্তা বলছে। তুমি যাই বলো সর্দার, আমার কিন্তু রাজা আর হুংমার মেলা মেশা মোটেই ভাল লাগেনা।

হিয়ংচু চোখ দু'টোকে ক্ষুদ্র করে নিয়ে ভ্রুকুঁচকে বলে আমারও কি ভাললাগে? মোটেই আমি দেখতে পারিনা ঐ রাজাটাকে। ও আসার পর থেকে হুংমা সব সময় যেন ওকে নিয়ে মেতে থাকে।

চিংচু চোখ বাঁকিয়ে আর একবার রাজাকে ও হুংমাকে দেখে নিয়ে বলে— হুংমা কিন্তু রাজা আসার আগে তোমাকে বেশি খাতির করতো।

হুঁ।

রাজাকে তুমি কাবু করতে পারলেনা হিয়ংচু?

কি করে ওকে কাবু করবো দেখলে তো সেকি মানুষ, না দৈত্য।

হিয়ংচু আর চিংচু যখন অদূরে কথা বলছিলো ততক্ষণে অন্যান্য শ্রমিকগণ হোটেল কক্ষে প্রবেশ করে নানা রকম হুই হুলোড়ে মেতে উঠেছে।

রাজা আর হুংমা চলে যায় দোতালার সিড়ি বেয়ে উপরে।

চিংচু বলে, কথাটা হুংমার বাবাকে বললে কেমন হয়?

না, এখনও সময় আসেনি। ওর বাবাকে বলবো যেদিন সেদিন রাজাকে এ হোটেল ছাড়তে হবে। কথাগুলো বললো হিয়ংচু।

এবার ওরা দু'জন হোটেল কক্ষে প্রবেশ করে দু'জন দুটো চেয়ার দখল করে নিয়ে বসলো।

❑

শ্রমিকরা সবাই যে যার কাজে চলে গেছে।

বনহুর আজ কাজে যায়নি, সে নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে সিগারেটের পর সিগারেট পান করে চলেছে। তার মাথার মধ্যে রাশি কৃত চিন্তা সাঁতার কাটছিলো আজ রাত দু'টোয় হামবার্টের বিশেষ অনুচর ফাংফা আসবে চিংচুকে নিতে। সে যদি চিংচুকে কথাটা বলতে ভুলে যায় তাহলে, তার পরিণতি নাকি অতি ভয়ঙ্কর কিন্তু সে এখনও বলেনি কথাটা চিংচুকে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে হুংমা এসে একরাশ জোছনার আলোর মত ছড়িয়ে পড়েলো বনহুরের শরীরের উপড়।

চমকে উঠলো বনহুর—হুংমা তুমি।

হুংমা তখনও বনহুরের শরীরের উপর নিজকে ছেড়ে দিয়ে আছে, বললো—আ—মি—হু—ং—মা—দেখতে পাচ্ছো—না?

একি হুংমা তুমি নেশা করেছো?

নেশা! নে—শা আমি করেছি—একটু—একটু সামান্য—সা-মা—ন্য.....রাজা?

বনহুর সোজা হয়ে বসে হুংমাকে দু'হাতে তুলে ধরে হুংমা তুমি নেশা করো এ আমি জানতামনা। তুমি না বলেছিলে চিংচু আর ওরা মন্দ লোক নেশা করে মদ খায়?

রাজা আর কোনদিন ওসব খাবেনা। তুমি যেন কোনদিন খেও—না কেমন? রাজা কথা দাও—কথা দাও তুমি নেশা করবেনা? যারা নে—শা করে তারা খুব—মন্দ লোক

তবে তুমি নেশা করলে কেনো?

রাজা ও তুমি বুঝবেনা। আমার মাকে মনে হলে আমি থাকতে পারিনা। এবার হুংমা বনহুরের বুকের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে তারপর বলে—তুমি শুনবে আমার কাহিনী?

বনহুর বিব্রত বোধ করছিলো, একটা জোয়ান মেয়ে এমন করে তার বুকে হেলান দিয়ে কথা বলছে; হঠাৎ যদি কেউ এসে পড়ে তখন কি মনে

করবে। যদিও এসব ব্যাপার এসব দেশে তেমন দোষণীয় নয় তবু ভাল লাগেনা ওর কাছে। বললো বনহুর—তুমি শুয়ে শুয়ে বলো আমি বসে বসে তোমার কথা শুনবো।

না আমি এই তো বেশ আছি। রাজা তুমি আমার এখানে একটা চুমু দাও, হুংমা আংগুল দিয়ে নিজের তুষার শুভ্র গন্ডটা দেখিয়ে দেয়।

বনহুরের শিরায় শিরায় ধমনিতে জাগে শিহরণ। একটা অদম্য অনুভূতি তাকে বিচলিত করে তোলে।

হুংমা সুকোমল শুভ্র বাহু দুটি দিয়ে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরলো, নেশাতুর অর্দ্ধ নির্মিলিত আঁখি দুটি মেলে তাকালো। কই, চুমু দেবেনা আমায়? সত্যি আমায় কেউ ভাল বাসেনা আমার বাবাও না। সবাই আমাকে.....নানা তুমি কিছু জানোনা। তুমি জানবেই বা কি করে। আমি তো আর তোমার কাছে কিছু বলিনি। জানবে কি করে তাই না?

বনহুরের চোখে তখন অপলক দৃষ্টি সে কোন জবাব দিতে পারেনা। স্থির নয়নে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে।

যদিও হুংমার মুখ থেকে তীব্র মদের গন্ধ বের হচ্ছে তবু বনহুর হাত দু'খানা সরিয়ে দিতে পারেনা নিজের গলা থেকে। মোহ গ্রস্তের মত বলে বনহুর—কই, বলো তোমার কাহিনী?

হাঁ আগে বলি না হলে তুমি আমায় চুমু দেবেনা? সত্যি রাজা কি সুন্দর তোমার দুটি চোখ, কি সুন্দর তোমার চুলগুলো, সত্যি কত সুন্দর তোমার নাকটা, কত সুন্দর তোমার দুটি ঠোঁট। অদ্ভুত তুমি রাজা। তোমার ঠোঁট দুটো আমার চিবুকে স্পর্শ করলে আমি অনেক, অনেক খুশি হবো। সত্যি তোমাকে আমি আমার কাহিনী শোনালে চুমু দেবে তো?

দেবো।

সত্যি?

হাঁ সত্যি।

জানো রাজা? সোজা হয়ে বসলো হুংমা তারপর অর্দ্ধ মেলিত আঁখি দুটি মেলে তাকালো বনহুরের মুখে। —আমার মা বাবার কাছে কোন দিন সুখি হয়নি। যেদিন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছিলো সেই দিন থেকে আমি দেখেছি আমার বাবা মাকে রোজ রোজ মারতো। মাকে কি সব বলতো মা শুধু বলতো তুমি আমাকে মেরে ফেলো আমি পারবোনা আমি পারবোনা...মায়ের কথা শুনে বাবা আবার মারতো, মা মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি যেতো। তবু মারতো, আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। মার কষ্ট আমাকে অস্থির করতো তবু তার কাছে যাবার সাহস হতোনা। মার সমস্ত শরীরে আঘাতের দাগ দেখেছি। কালো কালো জখমের

দাগ। জানো রাজা, মার বুকের এক জায়গায় গভীর একটা ক্ষত হয়ে গিয়েছিলো, বাবা বুট দিয়ে লাথী মেরেছিলো মায়ের বুকে। আজও আমার শরীর শিউরে উঠে। মার কথা বলতে বড্ড কষ্ট হয় আমার তবু বলছি তোমাকে। রাজা সব শুনে দুঃখ পাবে তবু বলবো তোমাকে। শুনবেনা তুমি?

শুনবো বলো?

একদিন রাতে মায়ের কান্না শুনে ঘুম ভেংগে গেলো আমার চোখ মেলতেই কুঁকড়ে গেলাম—দেখলাম বাবা মাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। মা চিৎকার করে বলছে—না, না তুমি আমার সর্বনাশ করো না। আমি যাবো না, আমি যাবোনা। তুমি আমাকে নিয়ে যেওনা। তবু বাবা মাকে টেনে নিয়ে গেলো পাশের কামরায়। জানো রাজা আমি যেন তখন কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। পাশের কামরায় অন্য একটা পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পেলাম তার সঙ্গে শুনতে পেলাম মার আর্তনাদ। বাবা কিন্তু তখন ফিরে এসেছে আমার ঘরে। সে ঘন ঘন পায়চারী করছে।

ওর কথাগুলো শুনতে শুনতে রাজার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো যেন, বললো—তারপর?

বাবা বার বার তাকাচ্ছে আমার দিকে। বলে চললো হুংমা আমি যেমন উঠতে যাবো অমনি বাবা আমাকে চেপে ধরে আমার বালিশে শুইয়ে দিলো। আমি ভয়ে কাঠ হয়েছিলাম আরও কাঠ হলাম। চুপ করে চোখ বুজে পড়ে রইলাম তারপর ঘুমিয়ে গেছি এক সময়। যখন ঘুম ভাংলো দেখি মা আমার পাশে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি কিছু বুঝতে পারলামনা। তাকিয়ে দেখলাম বাবা ঘরে নেই। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মা তোমার কি হয়েছে? মা আমার কথা শুনে আরও জোরে জোরে কেঁদে উঠলো। আমি তাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করলাম না। জানো রাজা তারপর থেকে মাকে রোজ রাতে পাশের ঘরে নিয়ে যেতো বাবা। কোন দিন টেনে হিচড়ে কোন দিন মেরে ধরে, কোন দিন মা স্বইচ্ছায় যেতো। দিনের পর দিন গড়িয়ে যেতে লাগলো। দেখতাম আমাদের হোটেলে খদ্দের আগের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে গেছে। রোজ রোজ নতুন নতুন মানুষ দেখতাম। তারা আমাদের হোটেলে দু'চার দিন থাকতো তারপর যাবার সময় বাবাকে অনেক টাকা দিয়ে চলে যেতো। পরে পরে আমি দেখছি মা তেমন আর কাঁদতো না কিন্তু মাকে সব সময় গম্ভীর দেখেছি। একদিন মাকে বাবা ওঘরে নিয়ে যাবার পর আমি চুপি চুপি তক্তার ফাঁকে চোখ রেখে দেখলাম, বাবা মাকে ওঘরে রেখে বেরিয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা মোটা বেটে লোক মাকে ধরে ফেললো, মা ধস্তা ধস্তি করলো লোকটার সঙ্গে। লোকটা জোর করে মায়ের দেহ থেকে.....না, না আর আমি বলতে পারবো না

রাজা। জানো তারপর দিন আমি মাকে সব কথা বললাম। মা জানতে পারলো আমি মার সব কিছু জেনে ফেলেছি তখন মা আমাকে বুকে জড়িয়ে অনেক কাঁদলো। রাজা আমি সেদিন তখনও বুঝতে পারি নাই মা কেনো আমাকে বুকে ধরে এমন করে কাঁদছে। থামলো হুংমা, চোখ দুটো ওর ছল ছল হয়ে এসেছে।

বনহুর তখন সম্পূর্ণ নীরব।

হুংমা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললো—পরদিন চিৎকার আর আর্তনাদের তীব্র শব্দে ঘুম ভেংগে গেলো আমার। জেগে উঠে দেখি হোটেলের বাসিন্দারা দৌড়াদৌড়ি করছে। বাবাকে দেখতে পেলাম না। আমি বিছানা ছেড়ে নিচে নেমে গেলাম। জানো রাজা কি দেখলাম, আমার মার দেহটা পড়ে আছে হোটেলের মেঝেতে। ভয়ে আঁতকে উঠলাম। মাকে চেনা যায় না যেন একটা পোড়া কাঠ। মা তার শরীরে আগুন দিয়ে পুড়ে মরেছে।

অস্ফুট কণ্ঠে বললো রাজা—তোমার বাবা এতোবড় শয়তান?

হাঁ রাজা, বাবা শয়তান। মা চলে যাবার পর আবার বাবার হোটেলের খদ্দের কমে এলো। আবার বাবার জীবনে এলো অভাব রাক্ষসীর করাল থাবা। অর্থের লালসা বাবাকে ভীষণভাবে পেয়ে বসেছিলো। বাবা মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতো। ক'বছর যেতে না যেতে বাবার ভাবনার অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে এলো। আমার শরীরে যৌবন দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বাবার চোখে একটা কেমন যেন লোভাতুর দৃষ্টির আভাস দেখতে পেয়েছি। বাবার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। মা মরে যাবার পর থেকে বাবা সব সময় আমাকে ভাল ভাল খেতে দিতেন। হয়তো বা আমাকে বড় করে তোলার জন্যই তার এতো আগ্রহ। আমি ক'বছর আগেও বুঝতে পারিনি বাবার মনোভাবের কথা। বুঝতে পারলাম দু'বছর আগে, বাবা যেদিন আমাকে ধরে নিয়ে গেলো একটা লোকের পাশে। লোকটা প্রথমে আমাকে আদর করে কাছে ডেকে নিলো তারপর অনেকগুলো টাকা গুজে দিলো আমার হাতে। খুশিতে আমার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো। হয়তো আমার চোখের চেয়ে বাবার চোখ দুটো বেশি জ্বলজ্বল হয়ে উঠেছিলো। সেদিন আমার সেদিকে খেয়াল ছিলো না। এরপর থেকে লোকটা রোজ আসতো আমাকে আদর করে টাকা দিতো। লোকটা কয়েক ঘন্টা থাকতো তারপর চলে যেতো। লোকটা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমার হাত থেকে চিলের মত ছো মেরে টাকাগুলো নিয়ে নিতো। তখন বাবাকে শূকরের মত দেখাতো। এরপর বাবা আমাকে আরও লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলো, তারা আমাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতো। আমার ভাল লাগতো না। একদিন ঐ লোকটা যে প্রথম থেকেই আমাকে

টাকা দিতো সে রাতে বাবার হোটেলে থাকবে বলে কথা হলো। রাতে বাবা মাকে যেমনভাবে টেনে হিচড়ে নিয়ে যেতো তেমনি আমাকেও নিয়ে গেলো ঐ ঘরে। আমি অবশ্য তেমন কোন ভয় পাইনি, একটু কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিলো বাবাকে দেখে। সেদিন বাবার মুখে একটা কঠিন ছাপ দেখতে পেলাম। থামলো হুংমা।

বনহুর ভ্রু কুঞ্চিত করে তাকিয়েছিলো হুংমার মুখে। আজ হুংমা তার সম্মুখে বসে যেমন করে তার জীবন কাহিনী বলছে এমনি করে একদিন শাম্মীও বলেছিলো তার জীবন কাহিনী। হয়তো বা হুংমার চেয়েও দুঃখময় ছিলো তার জীবন। তবু আজ হুংমার কাহিনী শুনে মনটা ব্যথা কাতর হয়ে উঠে। বলে উঠলো বনহুর—তোমার বাবা শুধু শয়তানই নয় নরপশু জানোয়ার।

হাঁ রাজা, সত্যি আমার বাবা তাই।

তারপর লোকটা তোমাকে প্রতি বারের মত আদর করে টাকা হাতে গুজে দিলো কেমন?

তাহলে তো আমি লোকটাকে দেবতা বলতাম।

তবে লোকটা দেবতা নয়?

না রাজা, সে আমার হাত ধরে নিজের পাশে বসিয়ে বাবাকে ইংগিৎ করলো বেরিয়ে যেতে। বাবা তক্ষুণি বেরিয়ে গেলো। আমার মনে তখন কেমন যেন একটা ভীতিভাব মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠলো। লোকটা লোলূপ দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছিলো আমার শরীরের দিকে। বাবা বেরিয়ে যেতেই লোকটা আমাকে দু'হাতে জাপটে ধরলো।

আর তুমি কি করলে?

ভীষণ জোরে কামড়ে দিলাম লোকটার হাতে।

বনহুরের চোখের সামনে ভেসে উঠলো মনিরার সঙ্গে তার একদিনের কথা। মনিরা তাকে চিনতে না পেরে নিজকে ওর কবল থেকে রক্ষা করার জন্য তার হাতে ভীষণভাবে কামড়ে দিয়েছিলো, দাঁত বসে গিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়েছিলো তার হাত দিয়ে। একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো বনহুরের ঠোটের ফাঁকে, ভাবে সে—মেয়েদের নিজকে রক্ষা করার জন্য তাদের দাঁতই প্রধান অস্ত্র। হুংমাও দাঁত দিয়ে নিজকে রক্ষার চেষ্টা করেছিলো।

বনহুর বললো—তারপর?

লোকটার কবল থেকে নিজকে সেদিন বাঁচিয়ে নিলাম। আমার দাঁতগুলো বসে গিয়েছিলো ওর হাতে। কাজেই লোকটা আমাকে ছেড়ে দিলো বাধ্য হয়ে। আমি ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম আমার ঘরের। বাবা পরে এসে অনেক ডাকা ডাকি করেছিলো কিন্তু আমি সে রাতে আর দরজা খুলি

নাই। বহুক্ষণ ধরে দরজায় পিঠ রেখে দাঁড়িয়েছিলাম। কখন যেন পা দুটো ধরে এসেছিলো, ভোরে জেগে দেখি দরজার পাশে মেঝেতে পড়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছি। রাতে কিছু খাইনি কাজেই খিদেতে পেট চোঁ চোঁ করছে। ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। গত রাতের ঘটনাটা মনের পর্দায় ভেসে উঠলো, আমি শিউরে উঠলাম। তখন বুঝবার মত বয়স আমার হয়েছিলো। বাবার ইচ্ছা আমাকে দিয়ে আবার তার হোটেলে সর গরম করে তোলে, বুঝতে বাকি রইলো না আমার। মাকে বাবা প্রতি রাতে কেনো পাশের ঘরে জোর করে নিয়ে যেতো এখন নতুন করে আমার স্মরণ হতে লাগলো। বাবার মুখখানা আমার কাছে ভয়ঙ্কর লাগতে লাগলো। কেমন করে বাবার হাত থেকে নিজকে বাঁচাবো ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এলো যাতে বাবাও খুশি থাকে, হোটেলেও খদ্দের হয় আর আমিও বাঁচি।

হুংমার মাথায় কি এমন বুদ্ধি এসেছিলো যা তার বাবাকে খুশি করেছিলো—হোটেলেও খদ্দের জুটিয়ে ছিলো আবার হুংমাও নিজকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে বনহুর হুংমার দিকে।

হুংমা বলে চলেছে—সেদিন থেকে আমি নতুন পথ বেছেছিলাম। কুঁকড়ে যাওয়া দুর্বল মনটাকে ঝেড়ে ফেলে সবল করে নিলাম। বাবার হোটেলের বাসিন্দাদের সবাইকে সন্তুষ্ট করে চললাম। জানো রাজা আজও কেউ আমার সতীত্ব নষ্ট করিতে পারেনি। সবাইকে আমি মাতীয়ে রাখি, আমি কাউকে ধরা দেইনি আজও.....একটু থেকে বললো হুংমা—বাবা জানে আমি তার হোটেলের সবাইকে নিজের দেহ দিয়েছি বিলিয়ে.....খিল খিল করে হেসে উঠে হুংমা। বাবা জানেনা তার মেয়ে শুধু অভিনয় করে চলেছে। রাজা আমি কাউকে মনের মত পাইনি তাই পারিনি তাকে গ্রহণ করতে। তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে.....

হুংমার কথায় একটুও আশ্চর্য হয়না বনহুর কারণ হুংমার শেষ কথাগুলো সে বহুবার বহু নারীর মুখে শুনেছে। দোষ সে কাউকে দেয়না কারণ জানে এ জন্য সে নিজেই দোষী বা দায়ী। নারীমন সব চেয়ে সরল সহজ আর দুর্বল তাই ওরা একটুতেই আত্মহারা হয়ে পড়ে। তেমনি হুংমা তার প্রেম ভালবাসা পাবার জন্য উন্মুখ হবে তাতে আর এমন আশ্চর্যের কি আছে?

হুংমা বনহুরের দিকে মুখখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলে আমার কাহিনী তোমাকে শোনালাম, আমায় একটু চুমু দেবেনা।

আজ থাক হুংমা আর একদিন?

না, আমি তোমাকে ছাড়বোনা তুমি বড্ড মিথ্যাবাদী। আমাকে তুমি ভাল বাসবেনা রাজা?

বাসবো।

তবে চুমু দাও।

হুংমা।

বাঃ দেরী করছো কেনো বাবা এসে পড়তে পারে। চিংচু আর হিয়ংচুকে আমি কেয়ার করিনা। ওরা সবাই লোভি ঠিক কুকুরের মত। জানো রাজা ওরা আমাকে চুমু দিতে চায় কিন্তু আমি ওদের ঘৃণা করি। রাজা বাবা আমার সর্বনাশ করবে যেমন আমার মায়ের করেছিলো। বাবাকে আমার বড় ভয়।

হুংমা তুমি যাও শুয়ে শুয়ে ঘুমাও গে।

না আগে চুমু দাও।

তাহলে চলে যাবে তো?

যাবো।

বনহুরের মাথাটা নত হয়ে আসে হুংমার মুখের দিকে।

ঐ মুহূর্তে হুংমার বাবা হিহুয়াংচি এসে পড়ে, কঠিন কণ্ঠে ডাক দেয়— হুংমা।

বনহুর সোজা হয়ে বসে।

হুংমা টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়—বাবা তুমি?

হুংমা, তুমি বিদেশী খদ্দেরের সঙ্গে এতোখানি মাখামাখি করবে আমি ভাবতে পারিনি। তোমার জন্য জিহাংহায় বহু খদ্দের আছে যারা তোমার জন্য আমাকে অনেক টাকা দেবে।

বাবা দিদেশী হলেও রাজা তোমার হোটেলের একজন বড় খদ্দের। বাবা রাজাও তোমাকে কম টাকা দেয়নি সে কথা এরি মধ্যে ভুলে গেলে?

টাকা সে পাওনার চেয়ে বেশি দিয়েছে সে কথা সত্য কিন্তু রাজা বিদেশী না হলে আমি তোমাকে কোন কথাই বলতাম না হুংমা এখন থেকে চলে যাও আর কোন দিন যেন রাজার সঙ্গে ওভাবে মিশবেনা। যাও যাও হুংমা।

হুংমা বাবার মুখের উপর আর কোন কথা বলতে সাহসী হলোনা। পাশের টেবিল থেকে ক্যাপটা তুলে নিয়ে মাথায় পরতে পরতে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর বুঝতে পারে এবার তার উপর বাক্যবাণ নিক্ষেপ হবে। সেজন্য বনহুর প্রস্তুত হয়ে নেয় কিন্তু হুংমা চলে যেতেই হুংমার বাবা এগিয়ে এসে ডান হাত খানা বাড়িয়ে বনহুরের হাতখানা ধরে ফেলে বলে—রাগ করোনা রাজা হুংমা বড্ড ছেলে মানুষ তাই কিছু বোঝেনা এমন দিনের বেলায় সে তোমার কাছে এসে মেলামেশা করলে আমার আর খদ্দেররা হঠাৎ দেখে ফেলতে পারে। তারা তোমার উপর আক্রমণও চালাতে পারে। আমি চাই

না তুমি বিপদে পড়ো। এরপর আমি হুংমাকে তোমার সঙ্গে মিশবার সুযোগ করে দেবো.....

বনহুরের ভ্রুকুঁচকে উঠে, বাপ হয়ে মেয়ের প্রতি যে ইংগিতপূর্ণ আভাষ চিহুয়াংচি দিলো তাতে ঘৃণায় বিরক্তিতে ভরে উঠলো ওর মুখ। কোন জবাব সে দিলো না তখন।

চিহুয়াংচি বেরিয়ে গেলো।

যাবার সময় আর একবার বনহুরের পিঠ চাপ্‌ড়ে দিলো যেন সে রাগ না করে।

এ হোটেলে সবার কাছে যা পায় তার চেয়ে বেশি পায় রাজার কাছে। রাজা যাতে খুশি থাকে এ জন্য হুংমার বাবার চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিলো না কিন্তু সে অন্যান্য খদ্দেরের সামনে রাজার সঙ্গে হুংমাকে মিশতে বারণ করতো। হুংমার বাবা জানতো জিংহা বাসীরা বিদেশীদের সংগে মেয়েদের মেলা-মেশা মোটেই পছন্দ করে না। হঠাৎ এ জন্য রাজার মত একটা খদ্দেরকে হারাবে বলে আশঙ্কাও ছিলো হুংমার বাবার।

অবশ্য এই ভরা দুপুরে যদিও হোটেলে শ্রমিকরা কেউ ছিলো না। তবু হুংমার বাবা সাবধানি মানুষ যদি কেউ এসে পড়ে তাই সে তখন সরিয়ে দিলো হুংমাকে। চিহুয়াংচি আরও জানতো হুংমাই তার হোটেলের মোহ। শ্রমিকরা ওর জন্যই এ হোটেল সরগরম করে রাখে তাই সে হুসিয়ার এ ব্যাপারে।

রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন বনহুর একা জেগে। তার মনে তখন চিন্তার স্রোত বয়ে চলেছে। হাত ঘড়িটা দেখে নেয় বনহুর রাত দুটো বাজতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি।

এমন সময় হুংমার বাবা পা টিপে টিপে এসে দাঁড়ালো বনহুরের বিছানার পাশে ফিস ফিস করে ডাকলো—রাজা, রাজা.....

রাজা তখন দু'চোখে অন্ধকার দেখছে, সর্বনাশ হলো যেন। একটু পরেই আসবে ফাংহা। সামান্য কয়েক মিনিট মাত্র বাকি এর মধ্যে তাকে চিংচু সাজতে হবে। যদিও চিংচুর ছদ্মবেশের সব কিছু সে সংগ্রহ করে ফেলেছে। তবুতো একটু সময়ের দরকার। চিহুয়াংচি কেন এসেছে জানেনা বনহুর। জবাব না দিয়ে পারলো না তাই সে চোখ মেলে বললো—বলো কি বলছো?

ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে বললো চিহুয়াংচি—চুপ, উঠে এসো আমার সংগে!

বনহুর বললো—কোথায় যাবো?

হুংমার ঘরে।

মুহূর্তে বনহুরের মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠলো। এবার বুঝতে পারলো কেনো হুংমার বাবা এতো রাতে তার কাছে এসেছে। মুখভাব প্রসন্ন করে

বললো—বড্ড খারাপ লাগছে চিহুয়াংচি আজ নয় পরে একদিন যাবো হুংমার ঘরে। তাড়াতাড়ি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে বনহুর।

চিহুয়াংচি চলে যায়।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে উঠে পড়ে। ওপাশের বেলকুনির ধারে গিয়ে ড্রেস পাল্টে নেয়। সম্পূর্ণ চিংচুর পোশাক। এবার স্যুটকেস খুলে ছোট্ট আয়নাখানা বের করে গোঁফ জোড়া নাকের নিচে লাগিয়ে নেয়। একটু কালী, তেল আর রং হাতের তালুতে ডলে মুখে চোখে কপালে মাথায় যেন রংটা কিছুটা তামাই দেখায়। এবার সিড়ি বেয়ে নামতে থাকে নিচে।

ঐ মুহূর্তে শোনা যায় হোটেলের বাহিরে গাড়ি আসার শব্দ। বনহুর দ্রুত নেমে আসে নিচে এবং হোটেলের বাহিরে এসে অভিনয় ভঙ্গীতে অভিবাদন জানায়। যেমন করে সে দেখেছিলো সেদিন ফাংফা এলে পিউলপাং-এর শ্রমিক দল তাকে অভিবাদন জানিয়েছিলো।

ফাংফা গাড়ি থেকে মুখ বের করে বললো—তাড়াতাড়ি চলে এসো।

চিংচু বেশী দস্যু বনহুর বিনা বাক্যে উঠে বসে গাড়ির পিছন আসনে। ফাংফা ঠিক ড্রাইভারের পাশে বসেছিলো। চিংচু উঠে বসতেই গাড়ি ছাড়বার আদেশ দিলো ফাংফা।

লাল কাঁকর বিছানো পথে লাল ধুলো উড়িয়ে গাড়িখানা ছুটতে শুরু করলো।

চিংচু একবার প্যান্টের পকেটে হাত বুলিয়ে রিভলভারখানার অস্তিত্ব অনুভব করে নিলো।

গাড়িখানা ইট পাথুরের পথে হোচট খেতে খেতে এগিয়ে চললো।

পিছন আসনে চিংচু।

আর সম্মুখ আসনে হামবার্টের প্রধান অনুচর ফাংফা।

গাড়িখানা কোথায় চলেছে জানেনা বনহুর। তার বাসনা এতো সহজে পূর্ণ হবে এ যেন সে আশাই করতে পারেনি আজ ক'দিন থেকে অবিরত ঘুরেছে কাজ করতে পাওয়ার নাম করে। কিন্তু কোন একটু সন্ধান পায়নি এ ক'দিনে।

অনেক কিছু চিন্তা হচ্ছিলো বনহুরের মনে।

যে পথে গাড়িখানা এখন এগিয়ে যাচ্ছে সে পথ পরিচ্ছন্ন মসৃণ পথ নয়। ভাঙ্গা-চূরা আর অন্ধকার। কোন লাইট পোষ্ট নেই এ পথে। জমাট অন্ধকারে এগিয়ে যাচ্ছে দুটো আলোর চোখ।

বনহুরের মনে হচ্ছিলো এ যেন তাদেরই দেশের কোন পরিচিত পথ। হোচট খেতে খেতে গাড়িখানা নেমে এলো মোটা পথে। আকাশে অসংখ্য তারা দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার খানিকটা হাল্কা লাগছে এখন।

চিংচুকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ফাংফা জানেনা বনহুর। নানারকম চিন্তার উদ্ভব হচ্ছে তার মনে। মাঝে মাঝে ফাংফার ভারী নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

পথটার দু'পাশে ছোট ছোট ঘরগুলো কুয়াসা ঝাপসায় অন্ধকারে ছবির মত লাগছে।

মাঝে মাঝে কোন কোন বাড়ির দরজার ফাঁকে ক্ষীণ আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসছে।

এবার চীনের প্রাচীরের কিছু অংশ নজরে পড়তে লাগলো। যেন আকাশে হেলান দিয়ে একটা বিরাট দেয়াল ঘুমাচ্ছে।

বনহুর বুঝতে পারে গাড়িখানা পিউলপং হোটেল থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো যেন গাড়িখানা।

এখানে আশেপাশে কোন বাড়িঘর বা জন প্রাণীর চিহ্ন নজরে পড়ে না। আচমকা গাড়িখানা থেমে পড়ায় চমকে উঠলো বনহুর।

সংগে সংগে ফাংফা ফিরে তাকালো চিংচুর মুখের দিকে। বললো ফাংফা—চিংচু জানো তোমাকে হামবার্ট কেনো ডেকেছে?

চিংচু জবাব দিলো, আমি জানবো কি করে।

হামবার্টের কাছে গিয়ে সব জানতে পারবে। চিংচু তোমার ভাগ্য ফিরে গেছে বুঝলে? এসো আমার সঙ্গে।

চিংচু বললো—চলো।

এসো।

কিন্তু আমার ভয় করছে।

ভয়। কিসের ভয়?

কোনদিন হামবার্টের সম্মুখে আসিনি কিনা তাই। কিন্তু এখানে তো কোন বাড়িঘর বা জঙ্গল দেখছিনা। শুধু একটি লাইট পোষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এতো দূরে এমন নিভৃত্ব জায়গায় প্রান্তরের মাঝখানে লাইট পোষ্ট ব্যাপার কি?

সব জানতে পারবে চিংচু। এসো আমার সঙ্গে। কথাটা বলে ফাংফা লাইট পোষ্টের দিকে অগ্রসর হলো।

যতই লাইট পোষ্টের নিকটবর্তী হলো চিংচু ততই বিস্মিত হচ্ছে কারণ এ ধরণের লাইট পোষ্ট সে কোনদিন দেখেনি। গোড়ার দিকে পিপে বা ড্রাম-এর মত উপরে ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে গেছে। ঠিক মাথায় একটা আলো জ্বলছে তবে অত্যন্ত নিস্প্রভ ম্লান।

ফাংফা এসে লাইট পোষ্টের নিচে দাঁড়ালো।

চিংচু ততক্ষণে এসে গেছে ঠিক তার পাশে। চিংচুর দু'চোখে বিস্ময়।

ফাংফা চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিলো আশে পাশে কোথায়ও জন প্রাণী নেই শুধু চাপ চাপ অন্ধকার ছাড়িয়ে আছে।

ফাংফা এবার লাইট পোষ্টের গায়ে এক জায়গায় একটা সাংকেতিক চিহ্নের উপর চাপ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে লাইট পোষ্টের পিপে বা ড্রামের মত অংশে একটি সুড়ঙ্গ পথ বেরিয়ে পড়লো।

চিংচুকে লক্ষ্য করে বললো—দেখবে, এ সব যা দেখছো এর এক চুল যেন কাউকে বলবেনা।

জিভ্ কেটে বলে চিংচু—আরে না, না, কিছু বলবোনা।

বললে তোমার মৃত্যু অনিবার্য তাতে কোন ভুল নাই।

জানি, জানি আমাকে এতো বুঝিয়ে বলতে হবেনা মালিক।

চলো। ফাংফা ঐ সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করে।

চিংচু তাকে অনুসরণ করলো।

ভিতরে প্রবেশ করতেই লাইট পোষ্টের দেহটার প্রবেশ মুখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেলো।

অদ্ভুত সে পথ।

চারিদিকে কেমন একটা ভয়ঙ্কর পরিবেশ।

চিংচু জিজ্ঞাসা করলো—এ সুড়ঙ্গ পথ কোথায় চলে গেছে জানাবেন কি ফাংফা রাজ?

দস্যু বনহুর একদিন চিংচুর মুখে শুনেছিলো চিংচু ফাংফা কে মাঝে মাঝে ফাংফা রাজ বলে ডেকে থাকে। তাই সে আজ তাকে সেই নামে সম্বোধন করলো।

ফাংফা খুশি হলো। এ ডাকটা তার কাছে বেশ প্রিয়। বললো ফাংফা—চীনের প্রাচীর দেখছো?

বারে চীনের প্রাচীর দেখবোনা? চীনের সন্তান আমি, চীন আমার জন্ম ভূমি.....

হাঁ শোন চিংচু?

বলুন ফাংফা রাজ?

হামবার্ট দস্যু চীনের সবচেয়ে বড় দস্যু তা জানো নিশ্চয়ই?

জানি। আর আপনিও কম নন তাও জানি। আর জানি বলেই তো আপনাকে এতো মানি।

হাঁ চিংচু, তা নাহলে কি আর চীন রাজ্যে এতো লোক থাকতে আমি তোমাকে চীন দস্যু রাজের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার ভবিষ্যৎ উজ্বল তো বটেই তোমার আর খেটে খেতে হবেনা।

চিংচূর কপালে গভীর চিন্তা রেখা ফুটে উঠে। কোন জবাব দেওনা সে বা আর কোন কথা বলেনা। একটা জানার বাসনা যদিও তাকে চঞ্চল করে তুলেছিলো তবু সে নীরবে ফাংফাকে অনুসরণ করে চলে।

কিছুটা অগ্রসর হবার পর দেখতে পায় চিংচু, সুড়ঙ্গটার মধ্যে বেশ প্রশস্ত হয়ে আসছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ফাংফা কারণ সম্মুখে একটা ঝুলন্ত লিফ্‌ট এগিয়ে আসছে দেখতে পেলো।

লিফট্‌খানা তাদের সম্মুখে এসে থেমে পড়লো।

ফাংফা চিংচু সহ উঠে বসলো লিফটে।

ওরা চেপে বসার সঙ্গে সঙ্গে লিফট চলতে শুরু করলো। অত্যন্ত দ্রুত বেগে লিফটখানা ইলেকট্রিক তার বেয়ে এগিয়ে চললো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লিফটখানা এমন এক জায়গায় এসে থেমে গেলো যেখানে আর কোন পথ বা মুক্ত জায়গা নজরে পড়েনা।

লিফট থেমে পড়ায় ফাংফা এবং চিংচু নেমে পড়ে।

ফাংফা এবার চিংচুকে লক্ষ্য করে বলে—আমরা চীনের প্রাচীরের পাশে পৌঁছে গেছি।

চিংচু বেশী দস্যু বনহুর তাকায়—এই সেই ঐতিহাসিক চীনের প্রাচীর। যেন প্রাচীর নয় একটি পর্বতের পাদমূলে এসে দাঁড়িয়েছে তারা। চিংচু বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে। লাইট পোষ্ট স্তম্ভ থেকে হাজার হাজার গজ দূরে চীনের প্রাচীর, মাত্র কয়েক মিনিটে তারা এসে পড়লো লিফটে চেপে।

ফাংফা বললো—আমরা এবার চীনের প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করবো। চিংচু যে জায়গায় আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে কেউ কোনদিন যেতে পারেনা, যদি কেউ যায় সে বেরিয়ে আসতে পারেনা।

চিংচু বললো—আমার ভাগ্যে বেরিয়ে আসার সুযোগ আসবে কিনা কে জানে।

ভয় পাচ্ছো চিংচু?

মোটেই না।

সত্যি তুমি বড় সাহসী।

যত সামান্য।

চিংচু তোমাকে বিশ্বাস করি তাই আমি তোমাকে এই দুর্গম সুড়ঙ্গ পথে নিয়ে এসেছি। চীনের সমস্ত পুলিশ বাহিনী শত শত বছর সন্ধান চালিয়েও কোনদিন এ সুড়ঙ্গ পথের সন্ধান পাবেনা। এই সুড়ঙ্গ পথ চীনের প্রাচীরের তলদেশ দিয়ে সোজা চলে গেছে প্রাচীরের মধ্য দেশে। সেখানে চীন দস্যু হামবার্টের গুহা। এখানে ত্রিরিশ জন দস্যু বাস করে আর.....

বলুন ফাংফা রাজ থামলেন কেনো?

না, না এতো কথা কাউকে বলার নিয়ম নয়। যতটুকু বলছি তোমাকে বন্ধু লোক মনে করি তাই।

হাঁ আমাকে বন্ধু বলেই মনে করবেন এই আমি চাই। যা বললেন ফাংফা রাজ আমি তাই করবো। কিন্তু একটা দুঃখ আমাকে সব সময় ব্যথা কাতর করে তোলে যাক সে কথা চলুন কোথায় যেতে হবে বলুন?

বলো, বলো চিংচু থামলে কেনো?

না বললে আপনি আমাকে.....একটু থেমে বললো চিংচু—আপনি যদি এই দূর্গের সম্রাট হতেন তাহলে মানাতো ভাল?

চিংচুর কথায় ফাংফার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো যেন। একটু হেসে বললো—তুমি যা বলছো একথা আমার মনেও মাঝে মাঝে উদয় হয় বটে কিন্তু চিংচু তুমি জানোনা হামবার্ট কত বড় শক্তি মান ভয়ঙ্কর।

ও তাই আপনি ভয় পেয়ে চুপষে থাকলে বুঝি?

চুপসে ঠিক নয়.....

কথা শেষ হয়না ফাংফার একজন ভয়ঙ্কর চেহারার লোক এসে অভিনয় ভঙ্গীতে ফাংফাকে অভিবাদন জানিয়ে বলে—চলুন, সম্রাট বাহাদুর আপনাদের দু'জনকে ডাকছেন।

চিংচু মনে মনে উচ্চারণ করে নিলো সম্রাট বাহাদুর। হামবার্ট সম্রাট বাহাদুর বনে গেছে। শয়তানটাকে এবার সায়েস্তা না করে ছাড়বোনা। জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস করেছি এবার তোমার জীবন লীলা সাঙ্গ হবে হামবার্ট কিন্তু তার পূর্বে তোমার চক্ষু এবং রক্ত ব্যবসার ঘাটি কোথায় তা আমার জানতে হবে.....

চিংচুর চিন্তা ধারায় বাধা পড়লো। ফাংফা বললো, এসো এবার সম্রাট বাহাদুরের কাছে যাই।

সম্মুখে একটা ছোট্ট লিফট্।

ফাংফা এবং চিংচু লিফ্টে উঠে দাঁড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে লিফ্টখানা সাঁ সাঁ করে উপরের দিকে চলতে শুরু করলো।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

চিংচু সহ ফাংফা পৌঁছে গেলো অদ্ভুত এক স্থানে। চারিদিকে জমকালো এবড়ো থেবড়ো পাথুরে দেয়াল। বিরাট উঁচু ছাদ। সহসা ছাদখানা নজরে আসে না। দেয়ালের কোণ ফুটোর মধ্য দিয়ে তীব্র আলোর রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে সেখানে।

অদ্ভুত এক পরিবেশ।

চিংচুর দৃষ্টি পড়লো সম্মুখে।

একটা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আছে তার অতি পরিচিত এক পা খাটো সেই ভয়ঙ্কর নর শয়তান হামবার্ট। দু'চোখে তার অগ্নি ঝরছে যেন।

চিংচু তাকিয়ে আছে, ভুলে গেছে সে তাকে অভিবাদনের কথা কারণ তার মনে একটা ভীষণ প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠেছে। শয়তান তার কাছ থেকে পালিয়ে একেবারে চলে এসেছে জিংহায়।

জিহাংহাকে চীনবাসীরা সংক্ষেপে জিংহা বলে উচ্চারণ করে থাকে ফাংফা বা দস্যু বনহুর নিজেও এই শব্দ ব্যবহার করে।

চিংচুকে লক্ষ্য করে ফাংফা বলে উঠলো—এনি আমাদের সম্রাট বাহাদুর.....

চিংচুর সম্বিৎ ফিরে আসে। একটা শব্দ উচ্চারণ করে —ও মাফ করো— কথাটা বলে ফাংফা যে ভাবে হামবার্টকে অভিবাদন জানালো সেই ভাবে সেও তাকে অভিবাদন করলো।

হামবার্ট বললো—এই সেই চিংচু?

ফাংফা পুনরায় অভিবাদন জানিয়ে বললো—হাঁ সম্রাট, এই সেই চিংচু। এর চাচা হুয়াংচু চীনের সবচেয়ে বড় যাদুকর।

চিংচু এবার তাকিয়ে ফাংফাকে দেখে নিলো কারণ তার মুখে চিংচুর সম্বন্ধে আরও একটা পরিচয় সে নতুন করে শুনলো।

হামবার্ট বললো—চিংচু তোমাকে এখানে কেন আনা হয়েছে এখনও জানো না। শোন চিংচু একটা কাজ তোমাকে করতে হবে ।

বলুন সম্রাট?

তোমার চাচা যাদুকর হুয়াংচুকে আমার প্রয়োজন। যত টাকা চাও তোমাকে দেবো, পারবে তাকে আনতে? কথাগুলো বলে থামলো হামবার্ট।

চিংচুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠলো যেন। যা সে চেয়েছিলো তাই সে পেলো, বললো—টাকা পয়সা পরের কথা আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য। কিন্তু কি প্রয়োজনে আমার চাচাকে—তা তো বললেন না? কারণ আমি তাকে বলতে গেলেই তিনি জিজ্ঞাসা করবেন সব কথা?

চিংচুর কথায় বললো হামবার্ট—তুমি অতি বুদ্ধিমান সুচতুর লোক দেখছি। তাকে যা বলতে হয় সাক্ষাতে বলবো তোমাকে নয়।

তাহলে আপনার কথা মত কাজ করা আমার হচ্ছে না কারণ আমার চাচা অত্যন্ত সুচতুর বুদ্ধিমান। আপনি এখানে তার সম্বন্ধে আমার সঙ্গে কথা বলছেন কিন্তু আমার চাচা তার যাদুর আসনে বসে সব জানতে পারছেন। এমন কি আপনি যে কারণে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কামনা করেছেন তাও তিনি যাদু মন্ত্র বলে জানতে পারছেন কাজেই আমাকে বললে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না সম্রাট।

বেশ শোন তবে চিংচু। ফাংফা আমার জিংহা দুর্গের প্রধান সহচর। ফাংফাকে আমি বেশি বিশ্বাস করি। কাজেই তুমি তারই পরিচিত জন। মনে রেখো যদি এর এক বর্ণ কথা বাহিরে প্রকাশ পায় তাহলে তোমার ঘাড়ে মাথা থাকবে না তাছাড়া.....তাকালো হামবার্ট ফাংফার দিকে—ওর মাথাটাও যাবে তার সঙ্গে।

হাতের মধ্যে হাত কচলায় চিংচু—এ কথা আমার জানা আছে সম্রাট। এক চুল আমি কাউকে বলবো না। এই আমি নাক কান স্পর্শ করে শপথ করছি।

হামবার্ট বললো এবার—শোন তাহলে যাদুকর হুয়াংচুকে আমার কি প্রয়োজন বলছি।

বলুন সম্রাট, বলুন?

কান্দাই-এর নাম শুনেছো?

শুনেছি।

কান্দাই শহরে এক দস্যু আছে পৃথিবীর কোন দস্যুর তুলনা হয় না তার সঙ্গে—জানো সে দস্যু কে?

সম্রাট আমি কি করে জানবো?

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দস্যু নাম তুমি জানো না?

সম্রাট আমরা আপনাকেই তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দস্যু হিসাবে জানি। আপনি ছাড়া আর যে কেউ আছে তাতো জানি না।

আমি তো সবার চেয়ে বড় কিন্তু...

বলুন সম্রাট, থামলেন কেনো বলুন?

সে আমাকেও নাকানি চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে।

সম্রাট।

হাঁ চিংচু। আমার সারাটা জীবনের তপস্যা সে বিনষ্ট করে দিয়েছে। আমার জঙ্গল বাড়ি ঘাটি সে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। আমাকে সে হত্যা করতে চেয়ে ছিলো কিন্তু ভাগ্যক্রমে পারেনি।

চিংচু দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে শুয়ে যাচ্ছিলো। অস্ফুট কণ্ঠে বললো—আপনাকেও সে হত্যা করতে চেয়েছিলো?

হাঁ চিংচু।

এতো বড় সাহস তার?

শুধু সাহস নয় সে দুর্দান্ত ভয়ঙ্কর.....

সম্রাট আপনার চেয়েও কি?

হাঁ চিংচু, তুমি তাকে দেখোনি জানোনা। আমি সেই দুর্দমনীয় দস্যুকে দমন করতে চাই। শক্তির দ্বারা আমি যাকে কাবু করতে পারিনি তাকে কাবু

করতে চাই যাদু বলে। হাঃ হাঃ হাঃ হামবার্টের সাধনা বিনষ্ট করে সে পৃথিবীর বুকে আজও বেঁচে থাকবে.....এ আমি হতে দেবোনা।

সম্রাট এখন আমি সব অবগত হলাম।

হামবার্ট এক গাদা টাকা বের করে চিংচুর হাতে দিয়ে বলে—এই নাও তোমার বখশীস। তোমার চাচার দ্বারা কাজ উদ্ধার হলে আমি তোমাকে আরও দেবো। আর তোমার চাচার জন্য রইলো আমার চীন প্রাচীর দুর্গের ধনাগার। ফাংফা যাও একে পুনঃরায় এর জাগায় পৌঁছে দিয়ে এসো। হাঁ মনে রেখো চিংচুর সব কথা যেন গোপন থাকে।

ফাংফা এতোক্ষণ নীরবে এক পাশে নত মস্তকে দাঁড়িয়েছিলো এবার সে মাথা কাৎ করে বললো—নিশ্চয়ই থাকবে।

যাও ওকে নিয়ে যাও তাহলে।

এসো চিংচু।

চিংচু ফাংফার অনুকরণে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেলো।

❑

চিংচু একাই বসে বসে নেশা পান করছিলো। হোটেলের কক্ষ সম্পূর্ণ জন শূন্য নীরব। হোটেলের বয়গণ কে কোথায় নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত।

হুংমাও নেই তখন, সে হয়তো কোথায় গেছে কে জানে।

দস্যু বনহুর এসে বসলো চিংচুর পাশের চেয়ারে। আংগুলের ফাঁকে তার সিগারেট রয়েছে। সিগারেট থেকে ধুম্র শিখা ধীরে ধীরে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে পিউলপাং-এর মৃদু মন্দ বাতাসে। হোটেলের মধ্যে একটা শান্ত পরিবেশ বিরাজ করছিলো।

বনহুর বাম হাতখানা রাখলো চিংচুর কাঁধে।

চিংচু তার নেশা জড়িত চোখ দুটো তুলে তাকালো বনহুরে দিকে—তুমি!

হাঁ আমি রাজা।

রাজা তুমি নেশা খাবেনা?

খেয়েছি।

খেয়েছো?

হাঁ।

বেশ বেশ তুমি অনেক ভাল লোক কিন্তু।

তুমিও খুব ভাল চিংচু। আমি তোমাকে অনেক ভালবাসি।

সত্যি বলছো রাজা?

সত্যি তুমি আমার অনেক প্রিয়? এ হোটেলে আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি তেমন আর কাউকে নয়।

সত্যি!

বললাম তো সত্যি।

হুংমাকে?

তোমার মত নয়।

রাজা! চিংচু রাজাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে। চোখ দুটো তার নেশায় ঢুলূ ঢুলূ করছিলো একবার বড় হয়ে আবার ধীরে ধীরে মুদে আসে।

বনহুর তার আঙ্গুলের ফাঁক থেকে সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে পায়ের জুতো দিয়ে পিষে চাপা কণ্ঠে বলে—চিংচু আমি একটা বিপদে পড়েছি।

বিপদ? নেশাভরা চোখ দুটো তুলে ধরে চিংচু বনহুরের মুখে।

বনহুর বলে—খুব বিপদ মানে আমার পিছনে একটা শত্রু লেগেছে, সে আমাকে হত্যা করতে চায়। চিংচু শুনেছি তোমার চাচা মস্তবড় যাদুকর তাই.....

হাঁ, এ কথা তুমি কার কাছে শুনলে? এ হোটেলে কেউ জানে না আমি কে?

তুমি কে তা কেউ জানেনা?

না। শুধু তুমিই জানো দেখছি। কিন্তু কি করে তুমি জানতে পারলে আমার চাচা মস্ত বড় যাদুকর?

আমি নিজেও একটু একটু যাদু বিদ্যা চর্চা করছি কিনা তাই...

ও বুঝেছি। হাঁ আমার চাচা খুব বড় যাদুকর। চীন দেশে তার মত যাদুকর আর দ্বিতীয় জন নাই। তার নাম.....

নাম হুয়াংচু।

তুমি তার নামও জানো রাজা?

সব জানি।

আমার চাচা হুয়াংচুর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?

পরিচয় হয়নি এই যা দুঃখ। চিংচু পারবে তুমি তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে?

সর্বনাশ!

কেনো?

কেউ তার সম্মুখে যেতে পারে না।

সে কি রকম?

আমার চাচার নিঃশ্বাসে আগুন ঝরে।

আগুন!

হাঁ, আগুন বের হয় তার নিশ্বাসে। কেউ তার সামনে যেতে পারে না।
তুমি যেতে পারো না চিংচু?
পারি কিন্তু অনেক কষ্টে।
আমিও যাবো তোমার মত কষ্ট করে।
কিন্তু আমার সাহস হচ্ছে না, যদি তোমাকে সে যাদুর দ্বারা জানোয়ার বানিয়ে ফেলে বা পাথরের মূর্তি বানিয়ে দেয়।
সে তো আমার খুব আনন্দের কথা। চিংচু তোমার চাচা মানুষকে জানোয়ার বানাতে পারে?
হাঁ। কত বানিয়েছে সে।
মানুষকে পাথরও বানায় বুঝি?
অনেক অনেক মানুষ আজ চাচার যাদু গুহায় পাথরের মূর্তি বনে আছে।
সত্যি! বনহুরের দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠে।
বলে চিংচু—হাঁ, সত্যি বলছি।
আমাকে তুমি নিয়ে যাবে তো?
কিন্তু!
কোন কিন্তু নয় চিংচু, তুমি যা চাইবে তাই দিবো।
দেবে? তাই দেবে?
দেবো।
হুংমার ভালবাসা ত্যাগ করতে পারবে?
এবার বনহুর অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়লো।
অবাক হয়ে গেলো চিংচু, এর পূর্বে সে কাউকে অমন করে হাসতে দেখেনি। অদ্ভুত সে হাসি বড় সুন্দর, বড় অপূর্ব। হাসি থামিয়ে বললো বনহুর—হুংমাকে আমি ভালবাসি এ কথা কে তোমাকে বললো চিংচু?
এ হোটেলের সবাই জানে।
তাদের সঙ্গে তুমিও কেমন?
হাঁ সবাই জানে আমিও জানি। হুংমা নিজেও বলে তুমি তাকে ভালবাসো।
হুঁ বাসি।
সে জন্যই বলছি তুমি যদি হুংমার ভালবাসা ত্যাগ করে তাকে আমার হাতে সপে দাও তাহলে তুমি যা বলবে তাই করবো। আমার চাচার কাছে নিয়ে যাবো।
নিশ্চয়ই হুংমার ভালবাসা ত্যাগ করবো।
বেশ আমিও তোমাকে আমার চাচার কাছে নিয়ে যাবো।

বনহুরকে কথা দিয়ে চিংচু ভাবনায় পড়ে গেলো কারণ চিংচু জানে তার চাচার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা মানে যমদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ, তবু চিংচু চেষ্টা করবে বলে আশ্বাস দিলো বনহুরকে।

বনহুর অবশ্য চিংচুর মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলো কাজটা যত সহজ মনে হয়েছিলো তত সহজ নয়।

চিংচু দু'দিনের ছুটি নিয়ে চলে গেলো চাচার সাথে দেখা করতে। যাবার সময় বনহুরকে কথা দিয়ে গেলো ফিরে এসেই নিয়ে যাবো সঙ্গে করে।

চিংচু চলে যাবার পর একদিন কাটলো দু'দিন কাটলো চিংচুর পাত্তা নেই। বনহুর বাইরে গেলেও সকাল সকাল ফিরে আসে, না জানি কখন চিংচু এসে পড়বে।

অবশ্য ইচ্ছা করলে বনহুর তাকে অনুসরণ করে চলে যেতে পারতো— চিংচু জানতেই পারতো না। বনহুর তা করেনি। অবশ্য তার কারণ ছিলো, প্রথম চিংচু ফিরে এসে কি বলে দেখতে চায় সে।

এ দু'দিন হুংমা ওর কোন এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলো যার জন্য বনহুর কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলো। না হলে প্রায়ই হুংমার ছেলেমিভরা আব্দার তাকে অস্থির করে তুলতো। মাঝে মাঝে বনহুর বিরক্ত না হয়ে পারতো না। অতি সাবধানে তাই এড়িয়ে চলতো বনহুর ওকে।

হুংমা কিন্তু বনহুরের মনোভাব মোটেই বুঝতে পারতোনা। সে মনে করতো—ও না এলেই বুঝি রাজা রাগ করে তাই একটু কোথাও গেলে ফিরে এসে বিনা সঙ্কোচে জড়িয়ে ধরতো বনহুরের গলাটা।

শঙ্খ শুভ্র বাহু দুটির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বনহুর বিরক্ত বোধ না করলেও বিব্রত বোধ করতো।

বলতো বনহুর—হুংমা তুমি এতো ছেলে মানুষ। কিছু বোঝনা—আমি তো তোমাদের দেশের লোক নই।

বলতো হুংমা—নাই বা দেশের মানুষ তোমাকে আমি ভালবাসি রাজা।

বনহুর পারতো না কোন জবাব দিতে।

বলতো হুংমা—রাজা, কই তুমি তো আমায় চুমু দিলে না? তোমার সুন্দর দুটো ঠোঁট, চিবুক, চোখ, কপাল...হুংমা ধীরে ধীরে হাত বুলায় বনহুরের মুখমণ্ডলে।

সরিয়ে দিতে পারে না বনহুর ওকে।

পরিবেশটা স্বাভাবিক করার জন্য বলে বনহুর—হুংমা, তুমি নেশা কেনো পান করো তাতো সেদিন বললে না?

হুংমা ক্রমান্বয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে একটু ভেবে বলে— সেদিন আমি তো তোমাকে সব বলেছি রাজা। হাঁ ঐ কথাটা সেদিন বলি বলি করেও বলা

হয়নি। বাবার কথায় যখন অবাধ্য হয়ে পড়ি, বাবার হোটেলের খদ্দেরদের যখন খুশি করতে যাইনা তখন বাবা আমাকে নেশা পান করায়।

নেশা পান করায় তোমাকে?

হাঁ রাজা, যেন আমি বাবার কথা শুনি। মানে সংজ্ঞা হারিয়ে যা খুশি তাই করি। কিন্তু কি জানো—আমি খুব চালাক মেয়ে। আমি কোনদিন ওদের নাগালের মধ্যে যাইনি। একটু হেসে বলে আবার হুংমা—ওরা আমাকে খুব বোকা মনে করে আমি যেন ওদের নাচের পুতুল। ওরা আমাকে যে ভাবে নাচাবে আমি তাই নাচবো।

হুংমা!

হাঁ রাজা, আমি বড্ড হুসিয়ার। সবাই আমাকে ধরতে চায় কিন্তু আমি ওদের নাগালের বাইরে।

তবে আমার কাছে তুমি নিজকে এ ভাবে....

হুংমা বনহুরের মুখে হাত চাপা দেয়—রাজা আমি শুধু তোমার হতে চাই। তুমি আমাকে ভালবাসো না?

বলেছি তো বাসি।

তবে চুমু দাও না কেনো?

হুংমা যদি খুশি হও বেশ.....

না, হুংমাকে তুমি পাবে না রাজা। হুংমা আমাদের। সূতীক্ষ ধার ছোরা নিয়ে সম্মুখে এসে দাঁড়ায় হিয়ংচু।

বনহুর যেমন অর্ধশায়িত অবস্থায় বসে ছিলো তেমনি থাকে। এক চুল সে নড়েনা বা হিয়ংচুর হাতে ছোরা দেখে তার চোখে মুখে ভীত ভাব ফুটে উঠেনা।

হুংমা ততক্ষণে সোজা হয়ে বসেছে, উঠে দাঁড়ায় সে ধীরে ধীরে।

হিয়ংচু বললো—রাজা, সেদিন খালি হাতে ছিলাম তাই আমাদের এতোগুলোকে কাবু করেছিলো—আজ, আজ কেমন করে তুমি রক্ষা পাবে?

বনহুর অতি স্বাভাবিকভাবে উঠে দাঁড়ালো তারপর বললো— সেদিন যেমন করে পেয়েছিলাম।

ও তুমি দেখছি ছোরা দেখেও ভয় পাওনি?

মোটেই না।

সত্যি বলছো?

হাঁ।

হুংমা সরে যাও আমি আজ রাজাকে খতম করবো।

না, না আমি রাজাকে হত্যা করতে দেবোনা ওকে আমি রক্ষা করবো। হুংমা ভয় বিহবল কণ্ঠে কথাগুলো বললো।

হিয়ংচূ হেসে উঠলো—তোমার জন্যই ওকে মরতে হলো। ও জানে—তুমি আমাদের সবার তবু সে একা তোমাকে পেতে চায়। বনহুরের ভ্রুজোড়া কুঁচকে উঠলো শুধু কোন কথা সে বললো না। প্রতিক্ষা করতে লাগলো। যে মুহূর্তে হিয়ংচু আক্রমণ চালাবে তখন সে তার পাল্টা জবাব দেবে।

হিয়ংচু বললো—হুংমা সরে যাও।

না।

হুংমা।

আমি তোমাকে ভয় করিনা হিয়ংচু।

তাই নাকি?

হাঁ, তোমার মত কুকুরকে আমি ঘৃণা করি।

হুংমা, এতো বড় সাহস তোমার—সঙ্গে সঙ্গে হুংমাকে টেনে নিয়ে তার বুকে ছোরা বসিয়ে দিতে যায় হিয়ংচু।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে হুংমার বুকে ছোরাখানা বসিয়ে দেবার পূর্বেই ছোরা সহ হিয়ংচুর হাতখানা ধরে ফেলে। তারপর কঠিনভাবে চাপ দিতেই ছোরাখানা খসে পড়ে ভূতলে। অমনি প্রচণ্ড এক ঘুষি। সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় সে ছোরাখানার পাশে।

বনহুর ওর পিছনের ঘাড়ের জামা ধরে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়—পর পরই লাগায় আরও একটা ঘুষি।

এবার হিয়ংচু পড়ে যায় দেয়ালের উপর।

ঝাঁকুনি খেয়ে সমস্ত ঘরখানা থর থর করে দুলে উঠে যেন ভূমিকম্প শুরু হয়েছে।

যেমন সে পুনরায় উঠে দাঁড়িয়েছে অমনি আবার লাগায় ঘুষি। নাকমুখ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে হিয়ংচুর। সে উবু হয়ে ছোরাখানা হাতে তুলে নিতে যায় কিন্তু বনহুর একখানা পা তুলে দেয় ছোরাটার উপর।

হিয়ংচুর নাজেহাল অবস্থা।

ছোরা নিতে না পেরে পালাতে যাচ্ছিলো।

বনহুর পিছন থেকে চেপে ধরলো ওর গলার পাশের জামার অংশ তারপর কঠিন কণ্ঠে বললো—খেয়াল রেখো হিয়ংচু আজকের কথাটা।

ছেড়ে দেয় বনহুর ওকে।

হিয়ংচু টলতে টলতে বেরিয়ে যায়।

ভীষণ রাগ হয় ওর তবু হিয়ংচু আজ কারো সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারেনা লজ্জায় কুঁকড়ে গেছে সে আজ আবার নতুন করে।

বনহুর ভেবেছিলো হিয়ংচু তার কাছে মার খেয়ে আবার গিয়ে হুংমার বাবার কাছে যা-তা লাগাবে। হয়তো বা প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে তার উপর কিন্তু আশ্চর্য হিয়ংচু সেদিনের পর থেকে যেন সাধু বনে গেলো একেবারে।

বনহুরকে দেখলেই ও দূর থেকে আলগোছে সরে পড়ে। হঠাৎ যদি মুখোমুখি হয়ে যায় তবে মাথা নিচু করে এক পাশে দাঁড়ায়, বনহুর চলে গেলে সে যায়। যেন শিক্ষক আর ছাত্র।

বনহুর হিয়ংচুর আচরণে মনে মনে হাসে।

হুংমা বলে—দেখলে তো রাজা হিয়ংচু তোমার কাছে হেরে গিয়ে কেমন বোকা বনে গেছে। আর কোনদিন সে তোমাকে কাবু করার চেষ্টা করবেনা। সত্যি রাজা তুমি বীর পুরুষ!

হুংমার কথায় মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে বনহুরের মুখে। বলে সে—এই সামান্য ব্যাপারে আমার প্রতি তোমার একটা বিরাট বিশ্বাস এনে দিয়েছে হুংমা। আসলে ও কিছু নয়। আমার চেয়ে ও অনেক বীর পুরুষ।

তুমি যে কি বলো রাজা। আমি তো নিজের চোখে দেখলাম হিয়ংচুকে তুমি কেমন নাজেহাল করে ফেললে। বীর পুরুষই শুধু নও তুমি অসীম শক্তিশালী।

তুমি যা বলছো না হয় তাই। বেশ এখন যাও হুংমা আমি এখন কাজে যাবো।

আমি থাকলে তোমার অসুবিধা হয় বুঝি?

না।

তবে যেতে বলছো কেনো?

হুংমা তোমার বাবা এবং তোমার বন্ধু বান্ধব যা ভালবাসেনা তা করোনা। আমি জানি ওরা তোমাকে আমার পাশে দেখতে চায়না।

ওরা কি চায় না চায় আমিও দেখতে চাই না, শুনতেও চাইনা। রাজা....হুংমা দু'হাতে বনহুরের গলাটা বেষ্টন করে ধরে বলে—তুমি, আমার হবে রাজা? বলো, বলো রাজা তুমি শুধু আমার হবে?

এক টুকরা হাসির আভাস ফুটে উঠে বনহুরের ঠোঁটের কোণে—আমি তো তোমাদের সবার জন্য হুংমা। তোমরা আমাকে যে যা বলবে আমি তাই করবো কিন্তু অন্যায় কিছু বললে বা করলে আমি তাকে সায়েস্তা করবো। যেমন হিয়ংচুকে আমি তার কাজের জন্য উচিৎ শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি।

সত্যি রাজা, তোমাকে বাহবা দিতে হয়। কিন্তু তুমি সবার জন্য নও। শুধু আমার.....

আরও গভীরভাবে হুংমা বনহুরের গলাটা আঁকড়ে ধরে।

বনহুর আলগোছে ওর হাত দু'খানাকে গলা থেকে মুক্ত করে নিয়ে বলে—বেশ, তুমি যা বলবে তাই হবে—আমি শুধু তোমারই থাকবো।

রাজা আমার ক'জন বান্ধবী আছে মাঝে মাঝে ওরা আমার বাবার হোটেলে আসে। তোমাকে ওরা দেখলে এক দম ছাড়বে না, ওরা তোমাকে নিয়ে যাবে। রাজা তুমি চলে যাবেনা তো?

না না তাকি যাই। তাদের কাউকে চিনিনা শুনিনা, আমাকে নিয়ে যেতে চাইলেই যাবো নাকি।

সত্যি যাবে না?

না।

ওরা অনেক দিন আসেনি ঠিক্ দু'চার দিনের মধ্যে এসে পড়বে। বড় খারাপ মেয়ে ওরা, ভাল লোক দেখলে নিয়ে যায়।

অবাক হবার ভান করে বলে বনহুর—ভাল লোক দেখলে নিয়ে যায় বলো কি হুংমা!

হাঁ।

কোথায় নিয়ে যায়?

কেনো ওদের হোটেলে।

তোমার বান্ধবীদের সবার হোটেল আছে?

থাকবেনা, ওরা যে সবাই হোটেল ওয়ালার মেয়ে তাই ওদের হোটেল আছে।

লোকগুলোই বা কেমন—যে নিয়ে গেলো আর তারা গেলো?

চীন দেশে একা নিয়ম।

কেমন?

পুরুষদের চেয়ে এখানে মেয়েদের অধিকার বেশি। যে মেয়ের কাছে যে পুরুষকে ভাল লাগবে তাকেই সে বিয়ে করতে পারবে।

আর পুরুষদের যদি কোন মেয়েকে ভাল লাগে—যেমন ধরো তোমাকে আমার ভাল লেগেছে, তোমাকে কি আমি বিয়ে করতে পারিনা?

এবার হুংমার মুখ ম্লান হলো, বললো—বলেছিতো পুরুষদের বেলায় ভাল লাগার কোন দাম নেই এ দেশে। রাজা যদি পুরুষদের ভাল লাগার দাম থাকতো তাহলে কবে হিয়ংচু আমাকে বিয়ে করে ফেলতো। চিংচুরও ইচ্ছা ছিলো কিন্তু ওরা কেউ আমাকে বিয়ে করবে এ কথা বলতে পারেনা।

তাহলে তোমার ইচ্ছাই ইচ্ছা কেমন?

হাঁ।

তুমি এতোদিন বিয়ে করোনি কেনো হুংমা?

বলেছি তো কাউকে আমার পছন্দ হয়না। কাউকে আমি কেয়ারও করিনা শুধু বাবার হোটেল চালু থাকার জন্য যা করি তা তো তুমি সব জানোই রাজা।

হাঁ জানি।

সব তোমাকে বলেছি..... একটু থেমে বলে হুংমা—আমার বাবার বন্ধুর মেয়েরা মানে আমারও বান্ধবী তারা, ওরা আসে যাকে পছন্দ হয় নিয়ে যায়।

তুমি কিছু বলো না?

ঠোঁট উল্টে বলে হুংমা—ওদের নিয়ে গেলে আমার বয়েই গেলো। এক জনকেও আমি পছন্দ করিনি।

এক জনকেও না?

না। সব যেন কেমন বিশ্রি শুধু তুমি ছাড়া। তাই তো আমি তোমাকে নিয়ে এতো ভাবনায় পড়েছি।

তার জন্য হুংমার ভাবনা দেখে ভাবনায় পড়ে যেন বনহুর। এতো ছেলে মানুষ হুংমা, ওকে দেখলে ওর কথাবার্তা শুনলে মায়া হয়। যেমন নীলার জন্য মায়া হতো তার। হুংমা শিক্ষাহীন আর নীলা ছিলো শিক্ষিতা তবু এদের উভয়ের মধ্যে নেই কোন পার্থক্য। হুংমাও যেমন তেমনি ছিলো নীলা, দু'জনাই অবুঝ।

শুধু নীলা আর হুংমাই নয় এমনি কত অবুঝ মুখ ভেসে উঠতে লাগলো বনহুরের মনের পর্দায়, এদের কথা মনে হলে হাসি পাওয়ার চেয়ে দুঃখ পায় সে বেশি। ওরা সরল সহজ মন নিয়ে তাকে ভালবাসে, তাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে কিন্তু সে তো কোনদিন পারেনি ওদের ভালবাসতে বা গ্রহণ করতে তবে মাঝে মাঝে সে বিচলিত হয়েছে। ধৈর্যচ্যুতিও ঘটেছে তার কিন্তু সংযম সে হারায় নি কোনদিন, সংযম তাকে সংযত রেখেছে। জীবনে সে একটি মেয়েকেই ভাল বেসেছিলো সে হলো মনিরা। নূরী ছিলো তার ছোট বেলার সাথী ওকে বনহুর স্নেহ করতো। নূরী যে কখন নিজের অজান্তে তাকে ভালবেসে ফেলেছিলো সে জানতো না— জানতে পেরেছিলো অনেক পরে যখন বনহুর মনিরার কাছে নিজকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলো তখন।

বনহুর যখন জানতে পারলো নূরী তাকে ছাড়া কাউকে বোঝেনা, কাউকে সে চায়না—এমন কি তাকে ছাড়াও নিজকে বিসর্জন দেবে তখন সে নূরীকে নিয়ে চিন্তা করেছিলো, তার আগে কোনদিন নূরীকে নিয়ে বনহুর ভাবেনি।

নূরী তার মনে আলোড়ন জাগালেও সে কোনদিন ভাবেনি ওকে সে বিয়ে করবে বা বিয়ে করতে পারবে তবু একদিন এমন এক মুহূর্ত এসেছিলো যেদিন সে তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলো। রহমান তার কর্তব্যের

দিকটা দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলো, সর্দার নূরীই আপনার দস্যু জীবনের প্রথম উৎস, ওকে আপনি বিমুখ করবেন না।

সেদিন রহমানের কথা ফেলতে পারেনি বনহুর। গভীরভাবে তলিয়ে দেখেছিলো রহমানের কথা মিথ্যা নয়। নূরীই তার দস্যু জীবনের প্রথম সঙ্গিনী সহচরী বান্ধবী। সেই শিশুকাল থেকে এতো বড় পর্যন্ত কত ঘটনা মনে পড়েছিলো সেদিন, মনে পড়েছিলো বহু স্মৃতি যে স্মৃতিগুলোর সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়েছিলো নূরী, তাই পারেনি বনহুর নূরীকে বিমুখ করতে। কতকটা সে বাধ্য হয়েই বিয়ে করেছিলো নূরীকে।

অবশ্য নূরীর ভালবাসা মনিরার চেয়ে কোন অংশে কম ছিলো না। শিশুকাল থেকেই নূরী মন-প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ছিলো বনহুরকে! সে ভালবাসা ছিলো পবিত্র নির্মল, ফুলের সুবাসের মত স্নিগ্ধ।

যদিও বনহুর কোনদিন নূরীর মনের দিকে তাকিয়ে দেখেনি কিংবা ওকে বুঝতে চেষ্টা করেনি তবু নূরী ওকে ভালবেসে গেছে প্রাণের চেয়েও বেশি। বহুদিন বনহুর ওকে উপেক্ষা করেছে, অবহেলা করেছে তবু নূরীর ভালবাসায় এতোটুকু শিথিলতা সে দেখেনি বা দেখতে পায়নি। মনিরার মধ্যে মাঝে মাঝে তবু রাগ অভিমান সে দেখেছে কিন্তু নূরীর মধ্যে সে কোনদিন দেখেনি এতোটুকু গাম্ভীর্য। সদা হাস্যময়ী নূরী আর মনিরা আদর্শবতী নারী। বনহুরের জীবনে এ দুটি মেয়ে ঠিক দু'দিক নিয়ে এসেছে। হয়তো বা প্রয়োজনও ছিলো এদের দু'জনার।

বনহুরের জীবন ছিলো বৈচিত্রময়ে ভরা সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না ও মোহ এ সব যদিও তাকে কোনদিন বিচলিত করতে পারেনি তবু কোন কোন সময় বনহুর ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়তো। তখন নূরীর সান্নিধ্যতার নিত্যান্ত প্রয়োজন হতো। ঝর্ণার মত চঞ্চলা নূরী তখন বনহুরের জীবনকে আনন্দ মুখর করে তোলার চেষ্টা করতো। আর যখন বনহুর খুশিতে উচ্ছল থাকতো তখন মনিরার পাশে ছুটে যেতো এক বুক আনন্দ নিয়ে। মনিরার অভিমান ভরা মুখখানা, ওর বড় ভাল লাগতো—ভাল লাগতো ওর অশ্রু সিক্ত দুটি চোখ। যে চোখের চাহনী তাকে অভিভূতই শুধু করতো না আত্মহারা করতো। কাজেই বনহুরের জীবনে নূরী আর মনিরা অভিশাপ নয় আশির্বাদ।

হঠাৎ বনহুরের চিন্তা ধারায় বাধা পড়ে। হুংমা সোজা হয়ে বসে বলে—চলো না রাজা, আজ মিনা বাজারে যাই?

মিনা বাজার!

হাঁ বড় সুন্দর এই মিনা বাজার।

মিনা বাজারে তো শুধু মেয়েরাই যায়।

না, চীনা দেশের মিনা বাজারে পুরুষগণও যায়। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

বেশ যাবো। যাও তৈরি হয়ে এসো গে হুংমা। আমিও তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

হুংমা খুশি হয়ে বেরিয়ে যায়।

কয়েক মিনিট পরে ফিরে আসে হুংমা।

অবাক চোখে তাকায় বনহুর ওর দিকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে—আজ হুংমার শরীরে নতুন ড্রেস। চীনা মেয়েদের পোশাক শোভা পাচ্ছে তার শরীরে।

বনহুর বললো—চমৎকার।

হুংমা হেসে বললো—কেমন লাগছে আমাকে?

বললাম তো চমৎকার।

হুংমাকে বনহুর কোনদিন এ পোশাকে দেখেনি, সত্যি বড় সুন্দর লাগছে ওকে।

হুংমা বললো—চলো রাজা, দেরী করছো কেন?

হাঁ, চলো।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

হুংমা বললো—কই তুমি পোশাক পাল্টে নাওনি তো?

আমার এই পোশাকেই চলবে। নিজের শরীরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নেয় বনহুর।

হুংমা ওর হাত ধরে বলে—চলো তাহলে।

এক রকম প্রায় টেনেই নিয়ে চলে হুংমা বনহুরকে।

কাঠের সিড়ি বেয়ে নেমে যায় ওরা দু'জন।

একটা এক্কা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে উঠে বসে হুংমা। হাত বাড়িয়ে বলে সে—এসো রাজা।

রাজা ওর হাতে হাত রেখে এক লাপে এক্কায় উঠে বসে।

এক্কা ছুটতে শুরু করে।

অল্পক্ষণেই অসমতল কাঁকড় বিছানো পথ পেরিয়ে মসৃণ রাজপথে গাড়িখানা এসে পড়ে। পথের দু'ধারে সুউচ্চ প্রাসাদ সমতুল্য অট্টালিকা। নানা রকম চাকচিক্যে ভরা দেয়ালগুলো অতি মনোরম। অগণিত গাড়ি ঘোড়ার পাশ কাটিয়ে ছুটে চলেছে এক্কাখানা।

বনহুর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো চারিদিক। পূর্বে কখনও চীন শহরে আসেনি তাই যত দেখে সে তত অবাক হয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় জিহাংহা সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। বাড়ি ঘরগুলোও আশ্চর্য গড়নে তৈরি। বেশির ভাগ বাড়িঘর বা দোকান পাটের দেয়ালে নানা ধরণের নক্সা

আঁকা রয়েছে। কোন দেয়ালে হাতী, ঘোড়া বা জিরাফ, কোন দেয়ালে বাঘ ভল্লুক, সিংহ, কোন দেয়ালে মানুষের ছবি। সামুদ্রিক জীবও গাছ গাছড়ার ছবিও বহু রয়েছে। বনহুর অবাক হয়ে এ সব দেখে।

এক সময় মিনা বাজার গেটে পৌঁছে যায় এক্কা গাড়িখানা।

বনহুর দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে দেখছে।

মিনা বাজারের গেটখানা অদ্ভুতভাবে তৈরি। গেটের উপরে ভয়ঙ্কর একটা জীবের ফটো। বিরাট হাঁ মেলে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর গাড়ি থেকে নেমেই দু'চোখ বিস্ফোরিত করে তাকালো ভয়ঙ্কর জীবটার ফটোর দিকে। জীবনে বনহুর বহু জীব দেখেছে এমন কি পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কিউকিলা তার সঙ্গে সে যুদ্ধও করেছে। কিন্তু এ কি ধরণের জীব ভেবে পায় না সে।

বলে হুংমা—কি দেখছো রাজা?

ঐ জীবটাকে।

ও তুমি চেনোনা বুঝি? ও জীবটা হলো আমাদের দেবতা।

দেবতা?

হাঁ আমরা ওকে পূজা করি।

একটা অদ্ভুত জীবকে তোমরা দেবতা বলে মানো আবার তাকে পূজা করো?

রাজা তুমি জানোনা—কত বড় দেবতা ও আমাদের। চীন যাদুকর হুয়াংচুর মেয়ে মাদামচিং এর দেবতা সে।

তাই তোমাদেরও দেবতা কেমন?

হাঁ। আমরা সবাই তার পূজা করি।

ও জীবটা কোথায় থাকে?

চীন পর্বতের গুহায়।

চীন পর্বতের গুহায় থাকে জীবটা?

হাঁ।

সে কি করে যাদুকর হুয়াংচুর মেয়ে মাদামচিং-এর দেবতা হলো?

সে এক অদ্ভুত কাহিনী। পরে এক দিন তোমাকে সব কথা বলবো।

আচ্ছা, তাই বলো।

তবে শুনে রাখো—যাদুকর হুয়াংচু ঐ কংঙ্গার পূজা করেই তাকে বাধ্য করেছে।

কংঙ্গা!

ঐ জীবটার নাম কংঙ্গা। চলো এখন আমরা মিনা বাজারের ভিতরে যাই।

চলো।

এগুলো বনহুর আর হুংমা।

এতো সুন্দর মীনা বাজার এর পূর্বে দেখেনি বনহুর। জিহাংহার মেয়েরা যে হাতের কাজ এতো সুন্দর করতে পরে নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয়না যেন।

মেয়েরা সব দোকান সাজিয়ে নিয়ে বসেছে। কেউ বা শুধু ফুলদানী। নানা রকম ফুলদানীতে নানারকম কারুকার্য খঁচিত। কতকগুলো মনি মুক্তা বসানো, হাতীর দাঁতে তৈরিও অনেক রয়েছে। কেউ বা পাখা নিয়ে দোকান সাজিয়েছে। নানা জাতীয় পাখা। বিচিত্র ধরণের নানা বর্ণের। কেউ বা মালা—ঝিনুকের পাথরের বহু রকমের। এমন কি হীরা বসানো মালাও রয়েছে সে সব দোকনে। কোন মেয়ের আংটীর দোকান—কত রকম যে আংটী সে দোকানে আছে তার ইয়ত্তা নেই।

শাড়ি ওড়না বা ঐ জাতীয় কাপড় চোপড় ছাড়া সব কিছুই আছে চীনা মেয়ে এবং পুরুষদের প্রয়োজনীয়।

হুংমা বললো—রাজা আমাকে একটা কিছু কিনে দেবেনা?

দেবো। বলো তুমি কি চাও?

হুংমা বললো—যা চাইবো তাই কিনে দেবো বলো কি চাও?

হুংমা এগিয়ে গেলো আংটীর দোকানের দিকে।

বনহুর ওকে অনুসরণ করলো।

হুংমা দোকানে গিয়ে আংটী দেখতে লাগলো। বনহুর ওর পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। হুংমা এক একটা আংটী আংগুলে পরে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখছে কোনটা তার আংগুলে হয়।

এমন সময় হঠাৎ চারিদিকে লোক জনের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যতা পরিলক্ষিত হলো।

হুংমা আংটী রেখে বললো—রাজা শীগগীর চলো—শীগগীর চলো, যাদু সম্রাটের কন্যা মাদামচীং আসছে।

মাদাম চীং।

হাঁ ও যদি এসে পড়ে তা হলে আর রক্ষা নাই। তোমাকে সে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে।

আমাকে?

হাঁ।

কেনো?

তুমি যে সুন্দর তাই..... আর দেরী করোনা রাজা। হুংমা বনহুরের হাত ধরে দোকানের অপর দিকে টেনে নিয়ে চলে।

কিন্তু ঐ পথেই যাদুকর হুয়াংচুর কন্যা মাদামচীং তার পাহারাদারগণ সহ এগিয়ে আসছিলো।

হুংমার সংগী বনহুরকে সে দেখে ফেলে।

হুংমাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

মাদামচীং এর দিকে তাকিয়ে অবাক হয় বনহুর অদ্ভুত পোশাকে সজ্জিত ওর দেহ। কতকটা রাজ কন্যাদের মত। চাকচিক্যে ভরা মাথায় মুকুট আছে। বনহুর আরও অবাক হলো মেয়েটির মাথার মুকুটে সেই অদ্ভুত জীবটার ছবি।

মাদামচীং বললো—শোন

হুংমা বনহুরের দিকে করুণ ভয়াতুর চোখে তাকিয়ে বললো— রাজা, তোমাকে রক্ষা করতে পারলামনা। কম্পিত পা ফেলে এগিয়ে গেলো হুংমা মাদামচীং এর দিকে।

মাদামচীং বললো ওকে নিয়ে এসো।

হুংমা কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিলো পিছিয়ে এসে পুনরায় বনহুরের হাত ধরে বললো—এসো।

বনহুর আর হুংমা এসে দাঁড়ালো।

হুংমা অভিনবভাবে অভিবাদন জানালো মাদামচীংকে, দু'চোখে তার ভয় আর উৎকণ্ঠার ছাপ ফুটিয়ে উঠেছে। একটু পূর্বে যে হুংমা আংটী কিনার জন্য ব্যকুল হয়ে উঠেছিলো এখন সেই হুংমা তার রাজাকে যাদুকরি মাদামচীং এর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু হুংমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। মাদামচীং দু'চোখ বিস্ফারিত করে বনহুরকে দেখে নিয়ে বললো—তুমি এর মূল্য কত চাও বলো?

হুংমা প্রায় কেঁদে ফেলে বললো—ওকে আমি বিক্রি করবোনা মাদাম।

মুহূর্তে মাদামচীং এর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো যেন দাঁতে দাঁত পিষে বললো—এ কথা বলতে সাহস হলো তোমার? তাকালো মাদামচীং তার সঙ্গে পাহারাদার দু'জনার দিকে—কি যেন ইংগিৎ করলো সে।

সঙ্গে সঙ্গে মাদামচীং এর অনুচরদের দু'জন এগিয়ে এসে হুংমার দেহে তাদের হাতের ছড়ি দ্বারা আঘাত করলো।

হুংমা মাটিতে পড়ে গেলো।

পুনরায় আঘাত করতে যাচ্ছিলো একজন।

বনহুর ওর হাতের চাবুক খানা ধরে ফেললো, বললো বনহুর—মাদাম ওর কোন দোষ নেই, যা বলতে হয় আমাকে বলো?

তোমাকে আমি কিনতে চাই বুঝলে?

হাঁ বুঝেছি?

হুংমা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, সে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বনহুরকে—না, না আমি ওকে বিক্রি করবোনা। রাজা, কোন অলক্ষুণে মুহূর্তে আমি তোমাকে এখানে এনেছিলাম।

বনহুর বলে উঠে—হুংমা, তুমি যা চাও তাই পাবে কেনো তুমি আমাকে নিয়ে এতো

আমি কোন কথা শুনতে চাইনা রাজা। মিনা বাজারে বহু লোক আছে মাদাম তুমি রাজাকে ছাড়া যাকে খুশি নিয়ে যাও। আমার রাজাকে আমি বিক্রি করবো না।

হুংমা একথা বলায় আবার মাদামচীং তার দু'জন অনুচরকে ইংগিৎ করলো—হুংমাকে দড়ি দিয়ে বাধবার জন্য।

ওরা এগুতেই বনহুর বললো—আমার জন্য তোমরা ওকে কষ্ট দিওনা। কোন মূল্যও দিতে হবেনা আমার জন্য, চলো আমি যাচ্ছি।

হুংমা আকুলভাবে কেঁদে উঠলো—রাজা, এ তুমি কি করছো?

জানোনা রাজা—মাদামচীং কত বড়.....

বনহুর ওর মুখে হাত চাপা দেয়।

হুংমা কথা শেষ করতে পারবেনা।

মাদামচীং বলে—আমি তোমার সঙ্গিনীকে বিমুখ করবোনা। এক গাদা টাকা বের করে হুংমার দিকে বাড়িয়ে ধরে—এই নাও।

হুংমা টাকার গাদা হাতে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয় মাদামের চোখে মুখে।

সঙ্গে সঙ্গে মাদামচীং ক্ষুব্ধ সিংহীর ন্যায় গর্জে উঠে—ওকে বেঁধে নিয়ে চলো আমি কংঙ্গার মুখে নিক্ষেপ করবো।

ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠে হুংমার মুখমন্ডল। শিউরে উঠে ওর সমস্ত শরীর। বলে উঠে হুংমা—না না, আমাকে তোমরা ধরে নিয়ে যেওনা মাদাম.....আমাকে তোমরা ধরে নিয়ে যেওনা .....আমার বাবার আমি একমাত্র মেয়ে আমি না থাকলে বাবা মরে যাবে.....

মাদাম বললো—তবে টাকা তুলে নাও। যাও, বাড়ি ফিরে যাও। ঐ টাকা দিয়ে তোমরা চিরদিন বসে বসে খেতে পারবে।

হুংমা কংঙ্গার মুখে যাবার ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে টাকার গাদাগুলো তুলে নিলো তারপর ফ্যাল ফ্যাল করে করুণ চোখে তাকালো বনহুরের দিকে।

বনহুর ওর পিঠে হাত রেখে বললো—কিছু ভেবোনা হুংমা আবার দেখা হবে।

মাদামচীং তার অনুচরদের আদেশ দিলো বনহুরকে তার গাড়িতে তুলে নিতে।

দু'পাশে দু'জন ধরলো বনহুরকে।

বনহুর কোন প্রতিবাদ করলো না আপন ইচ্ছায় সে চেপে বসলো মাদামচীং এর গাড়িতে।

গাড়ি চলতে শুরু করলো।

হুংমা করুণ আঁখি মেলে তাকিয়ে রইলো—তার প্রিয় রাজার দিকে।

বনহুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে পড়েছে। হুংমার দিকে তাকিয়ে বড় ব্যাথা অনুভব করছিলো সে। চোখ দুটো নিজের অজান্তে ছল ছলে হয়ে এসেছিলো বনহুরের। বনহুর হাত তুলে ওকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

হুংমার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোটা ফোটা অশ্রু। রাজাকে নিয়ে খুব দুঃচিন্তায় ছিলো হুংমা কখন ওকে সে হারাবে যা সে ভয় পেয়েছিলো তাই হলো। হুংমার কাছ থেকে যাদুকর কন্যা মাদামচীং কেড়ে নিয়ে গেলো তার রাজাকে।

হুংমা টাকাগুলো ছুড়ে ফেলে দিলো তারপর ফিরে চললো সে হোটেল পিউলপাং এ।

হোটেলে প্রবেশ করেই ছুটে গেলো হুংমা রাজার ঘরে। ওর শূন্য বিছানায় পড়ে কাঁদলো সে অনেকক্ষণ।

হুংমার বাবা কান্নার শব্দ শুনে ছুটে এলো। হুংমাকে এভাবে কাঁদতে দেখে সে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—কি হয়েছে হুংমা? হুংমা বলো কি হয়েছে? রাজা তোমাকে অপমান করেছে?

হুংমা পিতার কথায় মাথা তুলে তাকালো তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বাসিতভাবে কেঁদে উঠলো।

আজ হুংমার বাবা আদর না করে পারলো না। বললো—বল মা কেনো তুই কাঁদছিস?

বললো হুংমা—বাবা, রাজাকে মাদামচীং ধরে নিয়ে গেছে।

মাদামচীং রাজাকে ধরে নিয়ে গেছে?

হাঁ বাবা।

এবার হুংমার বাবার চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো, বললো—এ কি কথা বলছিস হুংমা?

যা সত্য তাই বলছি বাবা। আমি রাজাকে আজ জোর করে মিনা বাজারে নিয়ে গিয়েছিলাম। ও কোনদিন মিনা বাজার দেখেনি কিনা তাই। কে জানতো আজ মিনা বাজারে রাক্ষসী মাদামচীং আসবে। যদি জানতাম তাহলে এমন হতোনা। আজ আমি রাজাকে হারাতাম না.....ফুপিয়ে কেঁদে উঠে হুংমা আবার।

চিহুয়াংচি কন্যার পিঠে হাত বুলিয়ে বলে—শুনেছিলাম মাদামচীং কারো কাছ থেকে কোন জিনিস নিলে তাকে প্রচুর টাকা-পয়সা দেয়? রাজার বিনিময় তোকে কিছু সে দেয়নি?

হাঁ, দিয়েছিলো প্রচুর টাকা।

প্রচুর টাকা।

হাঁ বাবা।

চিহুয়াংচির চোখ দুটো মুহূর্তে উজ্বল হয়ে উঠলো—কোথায়? কোথায় সে টাকা হুংমা?

আমি রাজাকে বিক্রি করে সে টাকা ঘরে আনবো এতো নীচ আমি নই।

হুংমা টাকা তুমি নাওনি।

নিয়েছিলাম।

কই সে টাকা?

ছুড়ে ফেলে দিয়ে এসেছি।

হুংমা! এতোগুলো টাকা তুমি ছুড়ে ফেলে দিয়ে এসেছো বলোকি?

হাঁ বাবা। রাজার বিনিময় আমি টাকা নিতে পারবোনা। টাকা আমার কোন দরকার নাই।

হুংমা তোমার টাকা দরকার না থাকতে পারে। কিন্তু আমার আছে। কেনো তুমি টাকা নাওনি?

বলেছি আমার দরকার নাই।

হুংমা।

ভয় দেখিয়ে আমার মায়ের দ্বারা তুমি বহু টাকা রোজগার করেছো। আমাকেও তুমি বাধ্য করেছিলে টাকা রোজগারে কিন্তু আর নয়। আমি পারবো না তোমার হোটেলের খদ্দেরদের মন যোগাতে।

হুংমা আমাকে তুই ডোবাতে চাস?

ডোবাতে নয় বাবা—তোমাকে বাঁচাতে চাই। তুমি হোটেলের ব্যবসা ছেড়ে দাও।

খাবো কি তাহলে?

হাজার হাজার শ্রমিক কলকারখানায় কাজ করে পেটের অন্ন জোগাড় করছে তুমিও তাই করবে।

আর তুই—তুই কি করবি হুংমা?

আমিও তোমার সঙ্গে কলকারখানায় কাজ করবো। আমার শরীরে যথেষ্ট শক্তি আছে।

বেশ—তাই হবে, আমি আমার হোটেল নষ্ট করে ফেলবো কিন্তু মনে রেখো হুংমা তোমাকে আমি খেটে খাওয়াবো না।

বাবা আমি বড় হয়েছি বুঝতে, শিখেছি এখন আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবেনা। হুংমা কথাগুলো শেষ করে দ্রুত সিড়ি বেড়ে নিচে নেমে যায়।

❑

গাড়ির ঝাকুনিতে কেমন যেন মাথাটা ঝিমঝিম করছিলো বনহুরের। কতদিন কত রকম গাড়িতে সে চেপেছে কিন্তু কই কোনদিন তো তার এমন হয়নি। একটা কেমন সুমিষ্ট গন্ধ তার নাকে প্রবেশ করলো। অতি সাবধানেও বনহুর নিজকে সংযত রাখতে পারলোনা। ঢলে পড়লো সে গাড়িখানার মধ্যে।

যখন বনহুর চোখ মেললো তখন সে অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলো তাতে সে বিস্মিত হলো।

চারিদিকে সুউচ্চ দেয়াল। ছাদ নজরে পড়ছেনা—দেয়ালের মধ্য থেকে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। কক্ষ না গুহা বোঝা যাচ্ছে না। একপাশে বিরাট একটা মূর্তি। মূর্তির পাশে কয়েকটা নর-মুন্ড এবং নর কঙ্কাল পড়ে আছে। একটা পাত্রে কিছু তরল পদার্থ নজরে পড়লো বনহুরের।

ধীরে ধীরে উঠে বসলো বনহুর।

একটি কঠিন শয্যায় সে এতোক্ষণ শায়িত ছিলো। মাথার নিচে কোন বালিশ ছিলোনা। সম্পূর্ণ চীৎ হয়ে পড়েছিলো সে।

উঠে বসে তাকালো চারিদিকে—যে দৃশ্য তার নজরে পড়লো তা সত্যি বিস্ময়কর। বনহুর বুঝতে পারলো তাকে কোন যাদু গুহায় আটক রাখা হয়েছে। তার চার পাশে নানা রকম যাদু বিদ্যার সরঞ্জাম ছড়িয়ে পড়ে আছে।

মনে পড়লো বনহুরের প্রথম যখন তাকে গাড়িতে তুলে নেওয়া হলো।

গাড়ি তো নয় যেন দোলনা।

বনহুরকে ওরা পিছন অংশে তুলে নিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলো। বনহুর কোন প্রতিবাদ করেনি কারণ চীন যাদু সম্রাট হুয়াংচুকে তারও যে প্রয়োজন। চিংচুর দ্বারা যে কাজ সে সমাধা করবে ভেবেছিলো সে সুযোগ তার আপনা আপনি এসে গেলো। হয়তো তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, নয় তার ভাগ্যে কোন কঠিন বিপদের সম্ভাবনা আছে। যা থাকে তার অদৃষ্টে তাই হবে। এমন একটা মুহূর্তে বনহুর বিনষ্ট করতে পারবেনা। তাই বনহুর কতকটা ইচ্ছা করেই চীন যাদুকরী মাদাচীং এর কাছে নিজকে সমর্পণ করেছিলো।

গাড়িতে বসে তাকিয়ে ছিলো বনহুর যতক্ষণ হুংমাকে দেখা যাচ্ছিলো ততক্ষণ সে নির্ণিমেষ নয়নে দেখছিলো ওকে। হুংমার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোটা ফোটা অশ্রু। হুংমা ওর দিকে তাকিয়ে কাঁদছে। বনহুর ও হৃদয়ের ব্যথা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করছিলো। নিজের অলক্ষ্যে তার চোখ দুটোও ঝাপসা হয়ে আসছিলো, কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলো তখন বনহুর।

বনহুর যতই নিজকে হুংমার কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করুক না কেনো তবু মন তার নিজের অজান্তে কখন হুংমাকে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলেছিলো। একটা গভীর মায়া জমে উঠে ছিলো, তার সে নিজেও তা উপলব্ধি করতে পারেনি। হঠাৎ হুংমাকে ছেড়ে এ ভাবে চলে যেতে মন তার ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিলো।

হুংমার চেহারাটা ক্রমেই ঝাপসা হয়ে এক সময় মিশে গেলো দূরত্বের ব্যবধানে। বনহুর এবার ফিরে তাকালো মাদামচীং এর দিকে। হরিণীর মত দুটি ডাগর ডাগর চোখ তারই দিকে স্থির হয়ে আছে।

বনহুর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করলো কিন্তু পারলোনা। তার চোখ দুটো যেন নিস্পলক হয়ে গেছে—আড়ষ্ট হয়ে গেছে একেবারে।

একি বনহুরের মাথাটা যেন কেমন ঝিম ঝিম করে উঠলো, হঠাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে ঢলে পড়লো সে গাড়ি খানার মধ্যে তারপর আর কিছু মনে নেই। এখন সে কোথায় এটা কোন কক্ষ না গুহা তাও বুঝতে পারছেনা।

অন্য যে কোন ব্যক্তি হলে ভীত হয়ে পড়তো কিন্তু ভয় পাবার লোক নয়। বনহুর একটা অদম্য জানার বাসনা তাকে অসীম সাহসী করে তুলেছে।

অত্যন্ত পিপাসা বোধ করলো বনহুর গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কতমাস বা ক'দিন যে সে এমন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলো জানেনা। উঠে দাঁড়ালো বনহুর, মাথাটা এখনও কেমন ঝিম ঝিম করছে। বার বার দু'টো চোখ উঠছে তার মনের পর্দায়। কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সে দুটি চোখে।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

পা দু'খানা তার টলছে।

ধীরে ধীরে এগুতে লাগলো বনহুর ওদিকের মূর্তিটার দিকে। ভাল করে তাকাতেই দেখলো সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক নারী মূর্তি।

বনহুরের দৃষ্টি ধীরে ধীরে নত হয়ে এলো। তবু আর একবার সে তাকিয়ে দেখলো মূর্তিটা। নর মুন্ডগুলো তাকে দেখে যেন দাঁত বের করে হাসছে। বনহুর তার শূন্য বিছানার দিকে তাকালো, ঐ বিছানাটা যেন তার অতি আপনা জন বলে মনে হলো।

বনহুর ফিরে চললো বিছানার দিকে।

দু'পা এগুতেই হোচট খেলো সে। পায়ের নিচে ছড়িয়ে আছে একটা নর কঙ্কাল। বনহুর পড়তে পড়তে টাল সামলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সম্মুখে তাকাতেই দেখতে পেলো কয়েকটা সাপের মূর্তি দেয়ালের সঙ্গে আটকানো রয়েছে। সাপের মূর্তিগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

লালচে অগ্নি বর্ণ একটা আলোকরশ্মি জমাট অন্ধকার ঘরখানাকে যেন আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছিলো। মূর্তিগুলো যেন এক একটা জীবন্ত রাক্ষস। এই মুহূর্তে ওরা যেন গ্রাস করবে তাকে।

বিরাট কক্ষ বা গুহাটার মধ্যে বনহুর যেন একটি লিলিপুট। অত্যন্ত পিপাসায় গলাটা শুকিয়ে গেছে। বার বার সে জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দু'খানা চেটে ভিজিয়ে নিচ্ছিলো। তবু সে হতাশ হয়নি দেখবে যাদুকর হুয়াংচুক, দেখবে তার যাদু বিদ্যা। বনহুর যাদু বিদ্যা বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করেনা সে মানুষের দৈহিক বলকে।

বনহুর বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারলো না সে ফিরে এলো তার বিছানার পাশে। এতোক্ষণ সে নজর করেনি, ভালভাবে তাকাতেই দেখলো যে বিছানায় সে শুয়ে ছিলো এতোক্ষণ সে বিছানাটা সত্যি সত্যি কোন বিছানা নয় কতগুলো মৃত দেহের উপর মোটা চামড়া বিছিয়ে বিছানা তৈরি করা হয়েছে। শিউরে না উঠলেও আঁতকে উঠলো বনহুর। কলা গাছের গুড়ি দিয়ে যেমন ভেলা তৈরি করা হয় তেমনি কতকগুলো শবদেহ দিয়ে একটা ভেলার মত তৈরি করা হয়েছে তারই উপরে বিছানা পাতা রয়েছে। বসার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো বনহুর কেমন যেন একটা বিদঘুটে গন্ধ লাগছে তার নাকে।

❑

ফাংফা চিৎকার করে বললো—চিংচু তুমি এসব কি বলছো?

হাঁ আমি তোমার সঙ্গে চীনের প্রাচীর দুর্গে দস্যু হামবার্টের গুহায় যাইনি।

মিথ্যে কথা বলতে তোমার এতোটুকু ভয় হচ্ছে না? তুমি হামবার্টকে কথা দিয়ে আসোনি? তার কাছ থেকে টাকা নাওনি?

না, আমি হামবার্টের কাছে যাইনি টাকাও আমি নেইনি।

আমি নিজে তোমাকে নিয়ে গেছি আর তুমি একেবারে আমার কাছে অস্বীকার করে বসলে চিংচু? জানো কার সঙ্গে কথা বলছো?

চিংচু সোজা বলে বসে—যা সত্যি আমি তাই বলছি। আমি তোমার সঙ্গে কোথাও যাইনি।

আবার সেই কথা? চলো তোমাকে নিয়ে যাবো।

কোথায়? আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে ফাংফা রাজ?

চীন দস্যু সম্রাটের কাছে।

না না আমি তার কাছে যাবোনা।

সেদিন তো কোন আপত্তি করোনি চিংচু। আজ কেনো এতো আপত্তি করছো তুমি?

আমি তোমার কোন কথা ঠিক্ বুঝতে পারছিনা ফাংফা রাজ? মাথায় কিছু ঢুকছেনা। সব যেন কেমন এলো মেলো হয়ে যাচ্ছে। এদিকে আমার বন্ধু রাজা হারিয়ে গেছে, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে....সর্বনাশ হয়ে গেছে ফাংফা রাজ.....

কোন কথা শুনতে চাইনা তুমি দস্যু হামবার্টের কাছ থেকে যে টাকা নিয়ে এসেছো তা তাকে নিজে গিয়ে ফেরৎ দিয়ে এসো। আর বলে এসো আমি আপনার এখানে আসিনি, চলো। ফাংফা তার দু'জন অনুচরকে আদেশ দিলো—ওকে হাত পা বেঁধে গাড়ির মধ্যে তুলে নাও।

মালিকের আদেশ পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে ফাংফার সঙ্গীরা চিংচুকে তুলে নিলো।

চিংচুর অবস্থা হলো সঙ্কটাপূর্ণ সে অস্থিরভাবে কান্না কাটা শুরু করে দিলো।

ফাংফা কোন কথা শুনলোনা চিংচুকে নিয়ে চললো চীনের প্রাচীরের মধ্যে হামবার্টের গুহায়।

সেই আলোক স্তম্ভের কাছে এসে থামলো গাড়িখানা। নির্জন প্রান্তরের গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো ফাংফা, সঙ্গীদের নির্দেশদিলো চিংচুকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিতে।

চিংচুর অবস্থা করুন, সে ভীত আতঙ্কিত বার বার সে ফাংফার হাত পা ধরে অনুরোধ জানাচ্ছিলো তবু ফাংফা কৌশলে ওকে লাইট পোষ্টের অভ্যন্তরে নিয়ে এলো তারপর নিয়ে চললো হামবার্টের নিকটে।

চিংচুর চোখে বিস্ময় ভয়, তাকে এক রকম টেনেই নিয়ে চললো ফাংফা।

চলতে চলতে বার বার চিংচু হোচট্ খাচ্ছিলো, কখনও বা দেওয়ালে মাথা ঠুকে যাচ্ছিলো।

লিফট পর্যন্ত টেনে হিছড়ে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছিলো ফাংফা ওকে লিফটের উপর, নিজেও সে চেপে দাঁড়ালো। অমনি লিফট্খানা সাঁ সাঁ বেগে ধাবিত হলো সোজা দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করে।

চিংচু আড়ষ্ট হয়ে গেলো একেবারে। এমন সে জীবনে দেখেনি, কাজেই আড়ষ্ট হবার কথাই বটে।

মাত্র কয়েক মিনিটেই চিংচু সহ ফাংফা পৌঁছে গেলো হামবার্টের সম্মুখে। হামবার্ট তার সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট।

ফাংফা হামবার্ট কে অভিবাদন জানিয়ে বললো—সম্রাট একে ধরে এনেছি।

হামবার্ট গর্জন করে উঠলো—চিংচু তুমি কি আমার সব কথা ভুলে গেছো? ভুলে গেছো তোমার পরিণতির কথা?

চিংচু কোন দিন হামবার্টকে দেখেনি।

হামবার্টের ভীষণ চেহারা দেখে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে চিংচু।

হামবার্ট রাগে উঠে দাঁড়ায়।

এক পা তার-খাটো, এক চক্ষু তার অন্ধ, সমস্ত মুখে বসন্তের গভীর দাগ, ভয়ঙ্কর লাগছে ওকে। চিংচু দু'চোখ কপালে তুলে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যায় ভূতলে।

হামবার্ট বিকট চিৎকার করে বলে—তোমার চাচা হুয়াংচুকে আমার দরবারে হাজির করবে বলে কথা দিয়ে গেলে অথচ তার পর কদিন হলো খেয়াল ছিলোনা তোমার? টাকাও নিয়েছো অথচ নিশ্চিন্ত বসেছিলে কেমন?

মালিক আপনি বিশ্বাস করুণ আমি কোনদিন আপনার সম্মুখে আসিনি বা আপনার কাছে টাকা নেই নাই.....কম্পিত কণ্ঠে কথাগুলো বললো চিংচু।

কিন্তু কে শোনে চিংচুর কথা।

হামবার্ট উঁবু হয়ে চিংচুর চুল ধরে টেনে তোলে তারপর প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দেয় ওর নাকের উপর। চিংচুর নাক দিয়ে দর দর করে গড়িয়ে পড়ে রক্তের ধারা।

হামবার্ট পুনরায় গর্জে উঠে—এমন মিথ্যা কথা বলতে সাহস হলো তোমার? ফাংফা এর জন্য তোমাকেও শাস্তি পেতে হবে।

ফাংফা অভিবাদন জানিয়ে বললো—আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ সম্রাট বাহাদুর।

চিংচু মিথ্যা বলার জন্য তুমিও অপরাধি কারণ চিংচু তোমার পরিচিত আমার নয়।

কিছু বুঝতে না পেরে চিংচু হাঁউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করে। উঁবু হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে চিংচু হামবার্টের পা।

সঙ্গে সঙ্গে হামবার্ট এক লাথি দেয় চিংচুর চোয়ালে। চোয়াল থেকে মাংস উঠে যায়, হাড় বেরিয়ে পড়ে বুটের আঘাতে। মুখ থুবড়ে পড়ে যায় চিংচু মেঝের উপর। হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে চেষ্টা করে কিন্তু পারেনা।

হামবার্ট পুনরায় বুট দিয়ে ওকে চীৎ করে ফেলে দেয় মেঝেতে তারপর একখানা পা তুলে চেপে ধরে ওর গলাটা। জোরে চাপ দেয় কঠিনভাবে।

একটা গোঁ গোঁ শব্দ বেরিয়ে আসে চিংচুর মুখ থেকে তারপর গড় গড় করে গড়িয়ে পড়ে খানিকটা তাজা রক্ত গাল বেয়ে। চোখ দুটো বেরিয়ে আসে মাংসের ভিতর থেকে। চিংচুর জীবন লীলা সাঙ্গ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

ফাংফার দেহটা তখন বেতস পত্রের ন্যায় থর থর করে কাপছে। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে তার মুখ মন্ডল, সে বুঝতে পারছে এবার তার পালা।

হামবার্ট শার্দুলের মত পা পা করে এগুয়ে ফাংফার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

বজ্র মুষ্টিতে চেপে ধরলো ওর গলার কাছের জামাটা। এক হেঁচকা টান মেরে টেনে নিলো খানিকটা সম্মুখে তারপর ডান হাতে নিজের কোমরের বেল্ট থেকে ছোরাটা খুলে নিয়ে বসিয়ে দিতে গেলো ওর তল পেটে।

ঐ মুহূর্তে বলে উঠলো ফাংফা—আমাকে মারবেন না মালিক আমি বুঝতে পেরেছি সব কিছু। চিংচুর কোন দোষ ছিলোনা.....

চিংচুর দোষ ছিলোনা বলোকি?

হাঁ মালিক দোষ আমার কারণ চিংচু এখানে আসেনি আমার চোখে ধোকা দিয়ে এসেছিলো অন্য কেউ।

ফাংফা!

সম্রাট আমাকে মাফ করে দিন, আমি সেই শয়তানটাকে ধরে নিয়ে আসবো, হাজির করবো আপনার সামনে।

কে সে শয়তান যে চিংচু বেশে আমার দুর্গে প্রবেশ করতে সাহসী হয়? কে সে?

মালিক সম্রাট.....সে পিউলপাং হোটেলের একজন খদ্দের।

ফাংফা—বলোকি?

হাঁ মালিক, আমার সন্দেহ হচ্ছে সে ছাড়া অন্য কেউ নয়। চিংচুর ছদ্মবেশে রাজাই এসেছিলো কারণ আজ বেশি স্পষ্ট মনে হচ্ছে সেদিন যে চোখ দুটো দেখেছিলাম সে চোখ চিংচুর চোখ বলে মনে হয়নি।

তবু তুমি তাঁকে নিয়ে এসেছিলো আমার দুর্গে? এতোবড় সাহস তোমার.....ছোরাখানা উদ্যত করে ধরে—এই মুহূর্তে তোমাকে খুন করবো।

মালিক আমাকে খুন করলে আসল শয়তানটাকে সাজা দেওয়া হবেনা। আমি সেই লোকটাকে নিয়ে আসতে চাই আপনার সম্মুখে। আপনি তাকে নিজের হাতে সাজা দিবেন মালিক। আমাকে খুন করে আসল দোষীকে হাত ছাড়া করবেন না।

চোখ দেখেই যদি তোমার সেদিন সন্দেহ হলো তাহলে তুমি তাকে নিয়ে এলে কেন? তাছাড়া তুমি তার ছদ্মবেশ খুলে ফেললে না কেন?

সেজন্যই তো ক্ষমা চাইছি মালিক। আমার সন্দেহ হলেও তেমন কিছু মনে হয়নি মানে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখিনি।

বুঝেছি তোমার অবহেলাই এ সর্বনাশের মূল। আমি যদি একদিন চিংচুকে দেখতাম তাহলে সে আমার চোখে ধূলো দিতে পারতো না। চিংচুকে চিনতেও আমার ভুল হতো না। কে সে সুচতুর ধূর্ত যে চিংচুর বেশে আমার চোখে ফাঁকি দিয়ে আমার দুর্গে প্রবেশ করেছিলো। যাও তাকে আমার সম্মুখে হাজির করো। যদি তাকে না আনতে পার তাহলে মৃত্যু তোমার অনিবার্য মনে রেখো। যাও—যাও ফাংফা।

ফাংফা কুর্ণিশ জানিয়ে পিছু হটে বেরিয়ে যায়।

হামবার্ট তার খোঁড়া পা দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় পায়চারী করে চলে।

ফাংফা শুরু করে রাজার সন্ধান।

জিহাংহার প্রতিটি রাস্তা প্রতিটি গলি প্রতিটি দোকান হোটেল, সিনেমা হল সন্ধান করে ফেরে সে রাজার খোঁজে।

কখনও হেটে, কখনও গাড়িতে, কখনও এক্কায় চেপে কিন্তু রাজাকে খুঁজে আর পায়না।

রাজা তখন যাদুকর কন্যা মাদামচীং এর যাদু কক্ষে বন্দী।

চারিদিকে তার যাদুর প্রাচীর।

সমস্ত দেয়ালে যাদুর মূর্তি।

বনহুর যাদু বিশ্বাস করতো না। যাদুর মায়াজালে সে একবার জড়িয়ে পড়েছিলো কিন্তু এমন ধরণের যাদুর প্রাচীরে আবদ্ধ হয়নি।

চারিদিকে শুধু যাদু আর যাদু।

পিপাসায় কণ্ঠ তার শুকিয়ে আসছে। মাথাটা এখনও ঝিম ঝিম করছে।

একটা অদ্ভুত শব্দ তার কানে আসছে যেন।

বনহুর শবদেহগুলোর দিতে তাকিয়ে পিছু হটতে লাগলো।

দেওয়ালের সাপগুলো যেন ফোঁস ফোঁস শব্দ করেছে।

অদ্ভুত সেই জীবটার মূর্তির চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

বনহুর তাকালো উপরের দিকে।

শুধু জমাট অন্ধকার।

হঠাৎ শিউরে উঠলো বনহুর ছাদের অন্ধকারে কতকগুলো মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় দোল খাচ্ছে। স্পষ্ট দেখা না গেলেও অস্পষ্ট ভাবে বোঝা গেলো। একটি নয় বেশ কয়েকটা মৃত দেহ মৃদু মৃদু দুলছে।

দুর্দ্ধান্ত দুঃসাহসী বনহুরের ললাটে ফুটে উঠলো বিন্দু বিন্দু ঘাম।

হঠাৎ দু'খানা হাত ঝাপসা অন্ধকারে এগিয়ে এলো তার সামনে।

চোখ রগড়ে তাকালো বনহুর এ হাত দু'খানা কার।

কিন্তু কোন দেহ নজরে পড়ছেনা।

হাত দু'খানা কোন নারীর তাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ হাতে মোটা বালা নজরে পড়লো। একটি পাত্র রয়েছে পাত্রে হয়তো বা পানি।

বনহুর তৃষ্ণার্ত, তাই সে দু'হাত বাড়িয়ে পানি পাত্র ধরতে গেলো। কিন্তু একি কোথায় সেই হাত বা পানি পাত্র। সব মিশে গেছে ঝাপসা অন্ধকারে।

বনহুর ফিরে তাকালো পিছনে।

সঙ্গে সঙ্গে নারী কণ্ঠের অদ্ভুত হাসির শব্দ।

বনহুর দু'চোখ বিস্ফারিত করে তাকালো। তবে কি ঐ ঝুলন্ত মৃত দেহগুলো তার অবস্থা দেখে হাসছে। দেয়ালের মধ্য থেকে যে আলোক রশ্মির আভা গুহা বা কক্ষটার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে সেই আলোক রশ্মিতে বনহুরের সুন্দর মুখমন্ডলে ফোঁটা ফোটা ঘামগুলোকে এক একটা মুক্তা বিন্দুর মত মনে হচ্ছিলো।

মাঝে মাঝে বনহুর হাতের পিঠে কপালের ঘামগুলো মুছে ফেলেছিলো।

বনহুর কোনদিন ভয় পায়নি বা ঘাবড়ে যায়নি। সে জীবনে বহু অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। যে সাগর তলে সাধারণ মানুষের প্রবেশ অসাধ্য সেই গভীর সাগর তলে সে বিনা দ্বিধায় প্রবেশ করেছে। একবার বনহুর গভীর খাদের মধ্যে ভীষণ স্রোত ধারার তলদেশে ডুবরীর পোশাকে প্রবেশ করেছিলো মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সে ভয় পায়নি। তার চরম শত্রু ছেদন করে দিয়েছিলো পাইপ রশি। ভয়ঙ্কর স্রোতের টানে তলিয়ে গিয়েছিলো, হারিয়ে গিয়েছিলো বনহুর কোন অজানায়। ভাগ্য ভাল ছিলো তাই সে জীবনে বেঁচে গিয়েছিলো নিশ্চিত মৃত্যু থেকে।

এমনি কত ভয়াবহ অবস্থায় পড়েছে বনহুর কিন্তু কোনদিন সে বিচলিত হয়নি বা ঘাবড়ে যায়নি। আজ সে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এমন অদ্ভুত কান্ড সে কোনদিন দেখেনি। বিশ্বাস করেনি বনহুর কোন দিন যাদু বলে কোন কিছু আছে।

একবার সে তার বাপুর মুখে একটা গল্প শুনেছিলো। আজও সেই কাহিনীটা বনহুরের কাছে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে মনে হয়। সেদিন বনহুর দস্যুতায় যায়নি তাজের পাশে বসে সে ওকে ঘাস খাওয়াচ্ছিলো কালু খা এসে বসে তার কাছে।

ফিরে তাকায় বনহুর—বাপু তুমি!

আজ বাহিরে যাসনি হুর?

তুমি তো যেতে বারণ করেছো?

হাঁ আমিই বারণ করেছি বনহুর কিন্তু কেনো করেছি জানিস?

তা কেমন করে জানবো? তুমি বললে তো জানবো?

কালু খাঁর চোখ দুটোতে কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠেছিলো, বলেছিলো—আজ একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি তাই তোকে যেতে দেইনি।

কালু খার কথায় বিস্মিত কণ্ঠে বলেছিলো সেদিন বনহুর—বাপু তুমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখছো তাই আমাকে আমার কাজে যেতে বাধা দিলে? আমি মনে করেছিলাম আর কিছু।

অবহেলা করিসনা বনহুর, স্বপ্ন কোনদিন মিথ্যা হয়না। তবে সব স্বপ্ন নয়, যে স্বপ্ন রাত্রির শেষ ভাগে দেখা যায় সেই স্বপ্ন কতকটা ফলে।

বনহুর জিজ্ঞাসা করছিলো সেদিন—কি স্বপ্ন তুমি আজ রাত্রির শেষ ভাগে দেখেছো বাপু?

বলেছিলো কালু খাঁ—জানি তুই বিশ্বাস করবিনা। আমিও করতাম না একদিন। হুর আজ আমি স্বপ্ন দেখছিলাম তুই বেশ কোন এক যাদুকরের যাদু পুরীতে আটকা পড়ে গেছিস। চারিদিকে শুধু যাদুর কারসাজি সে এক ভয়ঙ্কর স্থান। আমি দূর থেকে তোকে দেখছি কিন্তু কিছু করতে পারছিনা। ধীরে ধীরে আমি কোন অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেলাম আর তোকে দেখতে পাচ্ছিনা শুধু তোর আর্তচীৎকার শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ আমার ঘুম ভেংগে গেলো, সমস্ত দেহ আমার ঘামে ভিজে চুপষে গেছে। আমি বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

সেই কারণে তুমি আজ আমাকে বাইরে যেতে দিলেনা বাপু?

হাঁ বড় খারাপ স্বপ্ন এটা।

বনহুর কালু খাঁর কথায়, সেদিন হো হো করে হেসে উঠেছিলো।

গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলো কালু খা—তুই যাদু বিশ্বাস করিসনা বনহুর কিন্তু আমি করি।

বাপু তুমি এতোবড় বিখ্যাত দস্যু হয়ে যাদু বিশ্বাস করো? সত্যি আমি অবাক না হয়ে পারছিনা।

শোন বনহুর, কেনো যাদু বিশ্বাস করি তোকে বলছি।

বলেছিলো বনহুর—বেশ বলো শুনি।

সে এক অদ্ভুত কাহিনী.....বনহুরের মুখ থেকে দৃষ্টি চলে গেলো কালু খাঁর মুক্ত জানালা দিয়ে গুহার বাহিরে। বলতে শুরু করলো কালু খাঁ—আমি তখন কোথাও চাকরী বা কাজ না পেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাবা মারা গিয়েছিলো ছোট বেলায়, মা ছিলো সেও মারা গেলো বিনা ঔষধে। মাকে কবর দিয়ে আর বাড়ি মুখো হতে পারলাম না। একটা প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠলো আমার মনে। কেনো আমি কি এই পৃথিবীর একজন নই। একদল আছে যারা পৃথিবীর বুকে জন্মলাভ করে সোনার চামচ মুখে করে। আর একদল আছে যারা ডাষ্টবিনের পচাঁ চামচ মুখে করে। আর

একদল আছে যারা ডাষ্টবিনের পঁচা নিকৃষ্ট আহার কুড়িয়ে তিল তিল করে বেড়ে উঠে। বনহুর আমার মনে যে আগুন জ্বললো তা ঐ সোনার চামচ মুখে করে যারা জন্মায় তাদের বিরুদ্ধে.....সব তো তোকে বলেছি একদিন।

হাঁ বাপু সে সব কথা মনে আছে আমার।

আমি সভ্য জগতে স্থান না পেয়ে দস্যু জীবন বেছে নিলাম। যে ব্রত তোকেও বেছে নিতে বাধ্য করেছি আমি। হাঁ কি যেন বলছিলাম?

এরি মধ্যে সব ভুলে গেলে বাপু?

বনহুর সব ভুলে যাই আমি যখন আমার অতীত জীবনের কথা মনে করি। আমি তখন হারিয়ে যাই পৃথিবীর সেই দুঃস্থ অসহায় নোংরা মানুষগুলোর মধ্যে। কি বলছিলাম? বলছিলাম যখন আমি সবেমাত্র দস্যুতা শুরু করেছি, তখন একদিন এক নৌকায় হানা দিলাম আমি আর আমার দু'জন সহচর। ওরা বাইরে মাঝি মাল্লাদের উপর হামলা চালালো, আমি প্রবেশ করলাম নৌকাখানার ভিতরে। বনহুর তুই বিশ্বাস করবিনা তবু আমি বলবো।

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলো কালু খাঁ—ভেবেছিলাম নৌকার মধ্যে প্রচুর ধন সম্পদ আর ঐশ্বর্য পাবো কিন্তু যা দেখলাম অদ্ভুত সে দৃশ্য। একটি জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধা নৌকার মধ্যে শায়ীত। চোখ দুটো ওর কোঠরাগত। মাথায় দু' এক গাদা চুল আছে তাও একেবারে সাদা ধপধপে? মুখে দাঁত নেই শরীরের চামড়া কুঁচকে গেছে পোড়া বেগুনের মত লোকটা ধুকছে তার পাশে এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণী। প্রথমে আশ্চর্য হলাম পরে জিজ্ঞাসা করলাম—টাকা পয়সা কি আছে বের করো। হাঁ আর একটি কথা বলতে ভুলে গেছি, আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে জানিয়ে ছিলো ঐ নৌকায় প্রচুর ধন সম্পদ যাচ্ছে। কিন্তু হানা দিয়ে দেখলাম সম্পূর্ণ মিথ্যা। রাগে শরীর আমার গস গস করে উঠলো। তবু বললাম, কি আছে বের করো। বৃদ্ধা কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসে বললো—আমার সঙ্গে ধন-সম্পদ কিছু নাই শুধু আছে আমার স্ত্রী...বৃদ্ধের কথায় চমকে উঠলাম ভীষণভাবে। কবরে যার এক পা চলে গেছে তারই স্ত্রী কিনা এক তরুণী। তরুণীর বয়স ষোল বছরের বেশি নয়। চেহারা অতি সুন্দর। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ তারপর বললাম—তুমি যমের বাড়ি গিয়ে বসে আছো আর তোমার এই স্ত্রী? বৃদ্ধা বললো—হাঁ অনেক সখ করে বিয়ে করেছি। যদি ওকে নাও নিয়ে যেতে পারো। তবু আমাকে জীবনে মেরোনা। অনেক আশা আকাঙ্খা আছে, এ পৃথিবীর অনেক কাজ এখনও আমার বাকি .....বৃদ্ধের কথা শুনে হাসবো না কাঁদবো ভেবে ঠিক পেলামনা, তবু অনেক কষ্টে হাসি দমন করে

বললাম—তোমার বৌকে আমরা নিয়ে কি করবো কিন্তু মনে রেখো বাড়ি গিয়ে যদি একে তালাক না দাও তাহলে তোমার জীবন আমরা সংহার করবো। বৃদ্ধ বলে উঠলো—কেনো কেনো সংহার করবে তোমরা আমার এ অমূল্য জীবন? আমি বললাম—সে কথাও পরে ঐ দিন জানতে পারবে যেদিন তোমাকে আমরা পরপারে পাঠাবো। বেশি সময় নষ্ট না করে আমরা নৌকা থেকে বেরিয়ে এলাম। হঠাৎ পিছনে একটা বিকট অট্টহাসির শব্দ শুনতে পেলাম, ফিরে তাকিয়ে দেখি নৌকাখানার মধ্যে বৃদ্ধ নেই এক ভয়ঙ্কর চেহারার বলিষ্ঠ লোক দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে ঐ লোকটা আমাকে ফিরে তাকাতে দেখেই বললো—যা বেঁচে গেলি ভাগ্যিস সুন্দরীর মোহ তোকে আকৃষ্ট করেনি.....

এরপর আমরা কি ভাবে যে ঐ নৌকা থেকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তীরের দিকে সাঁতরে এলাম জানিনা। তারপর আর কোনদিন এমন ঘটনা ঘটেনি আমার জীবনে। পরে জানতে পেরেছিলাম ঐ নৌকাখানা কোন এক যাদুকরের ছিলো।

কালু খার কথাগুলো সেদিন বনহুরের কাছে একটা আজগুবি গল্প বলে মনে হয়েছিলো আজ বনহুর বুঝতে পারে যাদু বলে কোন একটা জিনিস আছে যা সম্পূর্ণ আজগুবি নয়। বনহুরের মনে কালু খার কথাগুলো আজ একবার বিদ্যুৎ গতিতে প্রবাহিত হয়ে চললো। বনহুর আজ নিজে যাদুর আবেষ্টনীতে আটকা পড়ে গেছে। হঠাৎ ফিরে তাকালো বনহুর—অগ্নিময় লালচে আলোতে বিস্ময় নিয়ে দেখলো একটা নগ্ন দেহ নারী মন্থর পদক্ষেপে তার দিকে এগিয়ে আসছে—চিনতে বাকি রইলোনা নারী অন্য কেহ নয় চীন যাদুকরের মেয়ে মাদামচীং। দু'চোখে তার নেশা।

পরবর্তী বই
চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে